ডাকাতের হাতে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শ্রীপ্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট • কলকাতা-১২

কুশলকুমারকে

দিলাম

ডাকাতের হাতে

বৈশাখ মাস—প্রায় সন্ধ্যাকাল। ধলেশ্বরী নদীর উপর দিয়া একখানি নৌকা চলিতেছে।

নৌকা চলিয়াছে তালতলা হইতে কমলাঘাটায়।

কমলাঘাটা হইতে ছোট-ছোট দুইটা খাল পার হইয়া, পাটক্ষেতের মধ্য দিয়া পথ ভাঙিয়া, তিন-চারটি বাঁশের নড়বড়ে সাঁকোর উপর দুলিতে দুলিতে তবে মুন্সিগঞ্জে পৌছান যাইবে। অনিল ইহারই মধ্যে ভারী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বুলুর কিন্তু ভারি ফুর্তি। সে বাবার সঙ্গে ছই-এর উপর বসিয়া নদীর জল দেখিতেছে। ঠিক মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক গাঙ-শালিক উড়িয়া গেল। কে যেন কতগুলি শাদা সিল্ক-এর পাৎলা রুমাল হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়াছে। বুলু হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ, কী সুন্দর বাবা। মাঝিকে বলে' ধরে' দাও না কতগুলো। দাদা, তোর এয়ার-গানটা ছোঁড়না একবার।

নৌকার দোলানিতে অনিল অত্যন্ত কাবু হইয়া পড়িয়াছে। পেটের মধ্যে নাড়িভুঁড়িগুলি কেঁচোর মত পাক খাইতেছিল। সে নীচেই পাটাতনের উপর মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছে। ডাঙায় পৌছিতে পারিলে সে বাঁচে।

তাহার চুলে আঙুল বুলাইতে-বুলাইতে মা কহিলেন—এই সামান্য নদীতেই তুই এমন কাবু হয়ে পড়লি—তুই না বড় হয়ে বিলেত যাবি? সে ত' প্রকাণ্ড সমুদ্র—তিমি-মাছের হাঁ-র মত এক-একটা ঢেউ।

অনিল কহিল—আমি জাহাজে করে' যাবও না—আমি যাব এরোপ্লেন চড়ে'। ছোট্ট একটা তারা হয়ে হাওয়ায় ভেসে যাব। জল দেখলেই আমার গা-বমি করে।

বলিয়াই সে মাঝিকে হাঁক দিল—আর কতক্ষণ, মাঝি?

লগি, ঠেলিতে-ঠেলিতে মাঝি কহিল—এই ঘণ্টাটাক্। মাইল দুয়েক আর আছে।

অনিল উঠিয়া বসিয়া কহিল—ঘণ্টাটাক্? এরোপ্লেন চড়ে' এক্ ঘণ্টায় দুশো মাইল স্বচ্ছন্দে চলে' যেতে পারতাম, মা।

নদী বলিতে অনিল গোটা পাঁচ-ছয় গোলদীঘির যোগফল বুঝিত, কিন্তু তাহা যে আঁকিয়া-বাঁকিয়া ঢেউ তুলিয়া গর্জন করিয়া এত জায়গা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বহিয়া চলিয়াছে তাহা সে কলিকাতার বাসার বন্দী কুঠুরীতে বসিয়া আন্দাজ করিতে পারে নাই। ধান-গাছকে সে তাহাদের বাড়ির সামনেকার দেবদারু-গাছেরই সগোত্র ভাবিত, জলের উপর কচুরি-পানার স্তূপ দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল, কে যেন সবুজ মখমলের বনাতে দিব্যি ফরাস বিছাইয়া রাখিয়াছে—নদীর পারের ছোট খড়ের ঘর ছাড়িয়া যে সব ছেলে-মেয়ের দল পাড়ে দাঁড়াইয়া অকারণে বুলু ও তাহাকে মুখ ভেংচায় তাহাদের দেখিয়া অনিলের দুঃখের শেষ নাই—উহারা এমন নির্বোধ যে কী করিয়া ট্রাম-গাড়ী চলে, রাস্তার উপরে দোতলা বাড়ির মত বাস যাওয়া-আসা করে, কলের ফুটার মধ্যে একটা আনি ফেলিলে দেখিতে-দেখিতে কেমন করিয়া প্লাটফর্ম-টিকিট বাহির হইয়া আসে, তাহার পকেটের কলম দোয়াতে না ডুবাইয়াও কেমন অনর্গল লিখিয়া যাইতে পারে—এই সব বেচারীরা কিছুই জানে না। উহাদের দিকে তাকাইলে অনিলের মায়া হয়।

মা'র সঙ্গে সে মায়ের মামাবাড়ি চলিয়াছে। তালতলার বাজারের কাছে কোথায় নাকি তার ঠাকুরদার বাবার একখানি বাড়ি ছিল, সে-বাড়ি কবে উড়িয়া গিয়াছে তাহার হিসাব নাই। সেই শূন্য ভিটেটা দেখিবার জন্য বাবার হঠাৎ একদিন সখ হইল। অনিল ও বুলু এই সুযোগে গ্রাম দেখিতে বাহির হইয়াছে। তালতলায় দুই দিন কাটাইবার পর মা-ও ছাড়িলেন না—তাঁহাকে তাহার মামাবাড়ি মুন্সিগঞ্জ ঘুরাইয়া আনিতে হইবে। আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া তাহারা নৌকা নিয়াছে। কিন্তু মুন্সিগঞ্জ আসে না।

যথেষ্ট হইয়াছে—এখন কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে তবে অনিলের ঘুম আসিবে, ক্ষুধা হইবে। এই তিন চারদিনে খালি ঘোলাটে জল আর লম্বা-লম্বা পাটের ডাঁটা দেখিয়া তাহার চক্ষু ক্ষয় হইয়া গেল। আবার পাটের ক্ষেতে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা দল বাঁধিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে। ভাবিতে অনিলের গা ভয়ে ছমছম করিয়া উঠে। ক্ষেত ত' নয়—প্রকাণ্ড বন। উহার

মধ্যে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে এ জন্মেও সে বাহির হইতে পারিবে না। আর, কী বিশ্রী এই নদীটা—শেষ হইবার নাম নাই। নৌকাটিকে নিয়া যেন লোফালুফি খেলিতেছে—একবার একটু বে-কায়দায় পাইলেই যেন গিলিয়া বসিবে।

অনিলের মনের ভাব টের পাইয়া রাক্ষুসী নদীটা যেন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দরকার নাই—গ্রাম দেখিবার সখ তাহার মিটিয়াছে। বাড়ি ফিরিয়া তাহার পড়ার ঘরের টেবিলের ধারে মাথা গুঁজিয়া আর-আর দিনের মত লুকাইয়া একটু ঘুমাইতে পারিলে সে কত আরাম পাইত। বুলুটার জন্য নৌকায় বেড়ানর বিরুদ্ধে কিছুই বলিবার জো নাই। বোকা মেয়েটার এত ফুর্তি হইয়াছে যে তাহার মুখ বন্ধ করে কাহার সাধ্য। নদী দেখিয়া তাহার ভয় করিতেছে শুনিলে বুলু মুখ বাঁকাইয়া নিশ্চয়ই তাহাকে ঠাট্টা করিবে। গা পাতিয়া সে-ঠাট্টা সে সহ্য করিতে পারিবে না। একে বুলু তার ছোট, তায় কিনা মেয়ে। নৌকায় তাহার সঙ্গে মারামারি করিবারও উপায় নাই। পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেই সর্বনাশ। উহার যা ইচ্ছা তা বলুক।

সব চেয়ে মজা হয় যদি খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া পরে চোখ মেলিয়াই সে দেখিতে পায় এই নদী-মাঠ-ক্ষেত-বন—সমস্ত কখন থিয়েটারের 'সিন্'-এর মত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—সে তাহার পড়ার ঘরের টেবিলের উপর ম্যাপ বিছাইয়া মনে-মনে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সে-মন এরোপ্লেনের চেয়েও দ্রুতগামী। এক মিনিটে সে বিলাত হইতে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া আসিতে পারে। একটি আধলাও খরচ হইবে না।

কিন্তু মা বলিয়াছেন—তার মামাবাড়িতে অনিলের সমবয়সী অনেক ছেলেপিলে আছে। একমাত্র সেই তাহার আকর্ষণ। কলিকাতার গল্প বলিয়া তাহাদের তাক্ লাগাইয়া দিবে এই ভরসায়ই সে যা-একটু মজা পাইতেছিল। তাহার গ্রিপ্-ডাম্বেল, এয়ার-গান, ছবির বই, নতুন ফ্যাশনের বুক-খোলা কোট, ফাউন্টেন পেন্, শুঁড়-তোলা নাগরা জুতা—সব দেখিয়াই তাহারা হাঁ হইয়া যাইবে। কিন্তু রাত করিয়া সেখানে পৌছিলে এতসব তক্ষুনি তক্ষুনি দেখান যাইবে না। ছেলেগুলি ততক্ষণে নিশ্চয়ই বিছানায় লম্বা হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

অনিল আবার বলিল—আর কত দূর, মাঝি? একটু জোরে বাও না।

উপর হইতে বুলু বলিল—ওপরে উঠে আয় দাদা, কেমন সুন্দর হাওয়া দিয়েছে এখন।

প্রথমে ঝির-ঝির করিয়া হাওয়া দিয়াছিল, এখন দেখিতে-দেখিতে সমস্ত আকাশ কালো করিয়া ঝড় উঠিয়া গেল। আসিবার আগে এতটুকু খবর পর্যন্ত দিল না। এতক্ষণ আকাশের কালো-কালো বিকটাকার দৈত্যগুলি যেন লোহার শিকলে বাঁধা ছিল, হঠাৎ ছাড়া পাইয়া একত্রে হুড়মুড় করিয়া জেল-ভাঙা কয়েদির মত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সারা আকাশে তাহাদের তুমুল জয়ধ্বনি শুরু হইয়া গিয়াছে। নেকড়ে বাঘের মত ধারাল নখ ও দাঁত দিয়া তাহারা যেন এখুনি আকাশটাকে ছিঁড়িয়া কুটি-কুটি করিয়া ফেলিবে।

বাবার হাত ধরিয়া ভয়ে মুখখানা এতটুকু করিয়া বুলু ছইয়ের তলায় নামিয়া আসিল।

দৈত্যগুলি জলেও দাপাদাপি শুরু করিয়াছে। নদীটা তাহাদের নাগর-দোলা, চারিদিকে ফুটন্ত ফেনা ছিটাইয়া তাহারা হোলি খেলিতেছে। শূন্য মাঠ ভরিয়া দুরন্ত ঝড় এঞ্জিনের বাঁশির মত দূর দূরান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে—কোথায় একটা-কি গাছের ঝুঁটি ধরিয়া দৈত্যরা তাহাকে সজোরে নাড়া দিতেই সেটা মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। বিদ্যুতের সঙ্গে-সঙ্গেই মেঘ-গর্জন। দৈত্যগুলি যেন ছুরির ফলার মত ঝকঝকে দাঁত বাহির করিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল। এখুনিই সমস্ত পৃথিবীকে তাহারা রসাতলে পাঠাইবে—তাহাদের হাতে কাহারো আজ নিস্তার নাই। ঘর-বাড়ি উড়াইয়া, গাছ-পাহাড় উল্‌টাইয়া, নৌকা-জাহাজ ডুবাইয়া সব তাহারা একাকার করিয়া দিবে—দেখি, কে তাহাদের ধরিয়া রাখে!

নৌকাটি দৈত্যগুলির চড়-চাপড় খাইয়া ক্রমাগত ডিগবাজি খাইতেছে। অনিল ও বুলুর বাবা অমরেশবাবু অসহায় স্বরে বলিয়া উঠিলেন—শীগ্‌গির পাড়ে নৌকো লাগাও মাঝি। এই ঝড় মাথায় করে' যেয়ে আর কাজ নেই।

মাঝিদের এতটুকুও ভয় নাই—একজন ত' গলুই-এর উপর বসিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে তামাক খাইতেছে। সর্দার-মাঝি বলিল—কী ভয় বাবু। কত ঝড় মাথার উপর দিয়ে এল-গেল—এই নৌকোর সামান্য একখানি তক্তা

পর্যন্ত খোঁয়া যায় নি। ঐ ত' কমলাঘাটা এসে পড়েছে। বলিয়া সে অন্য পারে একটা মিট্‌মিটে আলোর দিকে নির্দেশ করিল।

অমরেশবাবু বলিলেন—এই ঝড়ের মধ্যে এখন আবার পাড়ি দেবে নাকি? সর্দার-মাঝি জোরে-জোরে বৈঠা টানিতে-টানিতে কহিল—কতক্ষণ আর লাগবে? ঐ আলো দেখছেন না? এই এসে পড়লাম। কিছু ভয় করবেন না। এই করে' আমরা খাই—বৈঠা টেনে-টেনে হাতে কড়া পড়ে' গেল—

বলিতে-বলিতে নৌকা কিনার ছাড়িয়া প্রায় মাঝ-নদীতে আসিয়া পড়িল। সঙ্গে-সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হইয়া গেল—নদীর উপরে নদী। লক্ষ-লক্ষ ছিদ্রে আকাশের ট্যাঙ্কটি ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে—দৈত্যগুলি মহা আহ্লাদে অট্টহাস্য করিতে-করিতে স্নান করিতেছে। এইবার তাহারা নৌকাটাকে নিয়া 'রাগ্‌বি' খেলিতে শুরু করিল।

অনিল ও বুলুর মা চেঁচাইয়া উঠিলেন—শীগ্‌গির নৌকো ভেড়াও, মাঝি। তুমি সবাইকে ডুবিয়ে মারবে নাকি?

মাঝি আরো জোরে নৌকা চালাইতে-চালাইতে কহিল—কোথায় নৌকো লাগবে? দেখছেন না এখানটায় খালি কাশের জঙ্গল—তার ধারে মড়া পোড়াবার শ্মশান। ছেলে-মেয়ে নিয়ে কোথায় এখানে নামবেন, শুনি?

অনিল খাড়া হইয়া উঠিল। ভয়াবহ বিপদের সামনে পড়িয়া তাহার তুচ্ছ মাথা-ধরা কখন ছাড়িয়া গিয়াছে। সে মাঝির কথা শুনিয়া ধমক দিয়া উঠিল—হোক্ শ্মশান। তুমি ওখানেই আমাদের নামিয়ে দেবে। চল শীগ্‌গির, ফেরাও নৌকো। ঝড় থামলে পর ফের রওনা হওয়া যাবে।

মাঝি তবুও কথা শুনিতেছে না দেখিয়া বুলু বলিল—তোর এয়ার-গানটা বার করে' ছোঁড় না লক্ষ্মীছাড়ার কপালে—

মাঝি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দৈত্যের মতই চেহারা, স্ফীত পেশীগুলি বৃষ্টি পড়িয়া বিদ্যুতের আলোতে ঝিকমিক করিতেছে।

অনিলদের মা এইবার দস্তুরমত মিনতি করিয়া কহিলেন—না-হয় কমলাঘাটা পৌঁছতে দু'ঘণ্টা দেরি হবে মাঝি, তোমাকে বেশি করে' বক্‌শিস দেব—জলের ছাঁটে ভিজে সব একসা হয়ে গেল যে—

সর্দার-মাঝিও স্বর নামাইয়া কহিল—কেন মিছে ভয় করছেন। এই পৌঁছে গেলাম বলে'। এ এমন কী ঝড়! ভেতরে সবাই জড়ো হয়ে বসুন না। ঐ ত' আলো এসে পড়লো।

কাকুতি-মিনতিতেও মাঝিদের নিরস্ত করা গেল না। অমরেশবাবু অস্থির হইয়া উঠিলেন। ঝড় সমানে গর্জন করিয়া চলিয়াছে। যতদূর চোখ যায় আগে-পিছে ভীষণ অন্ধকার। দূরে আলো একটা দেখা যায় বটে—এই অন্ধকারে ঐ আলোটুকুই একমাত্র আশা—অসহায়ের সান্ত্বনা।

একটা ঢেউয়ের বাড়ি খাইয়া নৌকা প্রায় উল্‌টাইয়া গিয়াছিল—বুলু আর অনিল একসঙ্গে চেঁচাইয়া উঠিল। অমরেশবাবু বৃষ্টির মধ্যেই বাহিরে আসিয়া চীৎকার করিয়া কহিলেন—তোমার মতলবখানা কী? কেন তুমি পাড়ে না নিয়ে মাঝ-নদীতে নৌকো আনলে?

বুলু কহিল—মারো না ব্যাটাকে। হাতের লাঠিগাছটা ব্যাটার মাথায় বসিয়ে দাও না আচ্ছা করে'।

অনিল বোনের চুল টানিয়া দিয়া কহিল—চুপ কর্ বুলু সব তাতে তুই কেন আসিস ফোঁপরদালালি করতে? মাঝিকে মারলে নৌকো কে বাইবে শুনি?

মাঝি আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কথার কোন উত্তর না পাইয়া অমরেশবাবু খাপ্পা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু রাগিয়াই বা তিনি কী করিতে পারেন? এই উদ্দাম ঝড় বৃষ্টির রাত্রে সম্পূর্ণ নদীর উপর কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে? চীৎকার করিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না। ধারে-পারে কোথাও কোনো জনপ্রাণীর আভাস নাই—এই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর সম্মুখে তাহাদের মত সখ করিয়া কেহ কখনও ভাসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

নৌকা হঠাৎ কাৎ হইয়া পড়িল। সর্দার-মাঝি মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল—বোধ হয় আর বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না, বাবু—

তুমুল কান্নার রোল পড়িয়া গেল। মা বুলুকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আর্তকণ্ঠে ঈশ্বরকে ডাকিতে বসিলেন। অমরেশবাবু হায়-হায় করিতে

করিতে দুই হাতে চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন। আর অনিল জামার দুই পকেটে দুই হাত ডুবাইয়া দিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল—এমন দৃশ্য জীবনে সে আর দেখে নাই। এমন উন্মুক্ত ঝড় এমন বিশাল জল এমন ভীষণ অন্ধকার—দুই চক্ষু মেলিয়া তাহাই সে দেখিতে লাগিল।

নৌকা খানিক পরেই আবার সামলাইয়া উঠিল। মাঝিরা বেশ ওস্তাদ, সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র নয়। অমরেশবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—কোন রকমে পাড়ে নিয়ে ফেল মাঝি, যা আমাদের আছে সব তোমাদের দিয়ে দেব।

সর্দার-মাঝি চাপা গলায় কহিল—নিশ্চয়।

কিন্তু জল আর ফুরায় না। পাড় যে কোথায় তাহার কোনো ঠিকানা নাই। কমলাঘাটা বলিয়া যে-আলোটা মাঝি আগে দেখাইয়া দিয়াছিল তাহা হঠাৎ অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িল।

কিন্তু ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া দেখা গেল যে, কোথা হইতে একটা পাৎলা ছিপছিপে ডিঙি ঢেউ ঠেলিয়া কাছে আসিয়া ঠেকিয়াছে। কাঠের একটা বাক্সের মধ্যে একটা কুপি জ্বলিতেছে। দূর হইতে এতক্ষণ ঐ আলোটাই দেখা যাইতেছিল!

আর একখানা নৌকা দেখিয়া অমরেশবাবুরা কিছু আশ্বস্ত হইলেন। বিপদ যতই ভয়ঙ্কর হোক্, সেই বিপদে সঙ্গী পাইলে মানুষের খানিকটা আরামবোধ হয়। তাঁহাদের সাহায্যের জন্য ভগবান হয় ত' কাহাকেও পাঠাইয়া দিয়াছেন।

আশ্চর্য, দেখিতে-দেখিতে ঝড় থামিয়া গেল। নদী অনেকটা শান্ত হইয়াছে। বুলু কহিল—এত করে প্রার্থনা করলে ভগবান কি না শুনে পারেন?

মা বলিলেন—বলতে নেই ও-কথা। আরো ডাক তাঁকে।

—কিন্তু মা, সিল্ক-এর দামী ফ্রকটা একেবারে গেল। দেখ, চুলের রিবনটার কী হয়েছে। ভারী শীত করছে যে। এখন একটাও শুকনো কাপড় পাব না। মুন্সিগঞ্জের ওরা সব কী ভাবছে?

নৌকা থামিল। সদ্য-আগত ডিঙি হইতে কে-একজন এই নৌকার মাঝিকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল—তামাক আছে? এক ছিলিম দে না সেজে। শীতে কাঁপছি ঠক ঠক করে'—

সর্দার-মাঝি উত্তর দিলে—আছে বৈ কি? কে, সনাতন না? আয়।

সনাতন ডিঙি-হইতে নৌকায় লাফাইয়া উঠিল। ছইয়ের ভিতরে চাহিয়া কহিল—বা, বেশ ভাল সোয়ারিই পেয়েছিস দেখছি।

অমরেশবাবু অস্থির হইয়া কহিলেন—এইবেলা ঝড়-বৃষ্টি একটু থেমেছে—শীগ্‌গির বেয়ে চল, মাঝি। কখন আবার আকাশ ভেঙে পড়ে ঠিক নেই।

সনাতন রুক্ষস্বরে কহিল—দাঁড়ান বাবু, একটু সবুর করুন। বন্ধু-লোক এসে তামাক খেতে চাইছে, তাকে তামাক না দিয়ে নৌকো বাইতে হবে! আব্দার! কল্‌কে বার কর্, সর্দার।

সর্দার-মাঝির নাম গণেশ। সে বুলুর মাকে বলিল—দয়া করে' একটু গা তুলুন দিকি—পাটাতন সরিয়ে মাল-মশলাগুলি বার করি একবার।

মা সরিয়া বসিলেন। এক ফালি তক্তা সরাইতেই তলায় কতগুলি ধারাল অস্ত্র অমরেশবাবুর চোখে পড়িল। ভয়ে তিনি আঁৎকাইয়া উঠিলেন। কোন কথাই তাঁহার মুখে আসিল না।

বুলু ফ্রকটা চিপিতে-চিপিতে কহিল—আমরা জলে ভিজছি আর ওঁরা তামাক ফুঁকে চাঙা হচ্ছেন। পাড়ে গিয়ে তামাক খাওয়া চলত না?

গণেশ সরাসরি বুলুর মা'র কাছে আসিয়া হাত পাতিয়া কহিল—দিন—ঝড় থেমে গেছে—বক্‌শিস দিয়ে দিন এবার।

ভয়ে মা'র মুখ পাংশু হইয়া গেল। কহিলেন—এখুনিই বক্‌শিস কী? কমলাঘাটায় পৌঁছে দাও আগে।

গণেশ হাসিয়া বলিল—আর কমলাঘাটা! সমস্ত রাত্ বাইলেও সেখানে আজ আর পৌঁছানো যাবে না। অত হাঙ্গাম করে' কী হবে? সময় নেই আমাদের। দিন—গায়ের থেকে ভালয়-ভালয় গয়নাগুলো খুলতে থাকুন। খুকি, তোমার ঐ হার-ছড়াটা আমাকে বক্‌শিস দেবে না?

নৌকার মধ্যে আবার একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। বুঝিতে আর কাহারও দেরি হইল না যে, তাহারা ডাকাতের হাতে পড়িয়াছে। নির্জন বিক্ষুব্ধ নদীতে—কোথায় কোন অপরিচিত জায়গায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে কে জানে—এই অন্ধকার রাত্রে শেষকালে তাহাদের ডাকাতের হাতেই প্রাণ হারাইতে হইবে!

গণেশ আবার কহিল—দেরি করার সময় নেই। দিয়ে দিন শীগ্‌গির। বাক্স-প্যাটরাগুলো ডিঙিটায় তুলতে থাক্‌, সনাতন। বিছানাটা? ওটা নদীতে ভাসিয়ে দে।

সনাতন অন্য একটা ছোকরার সাহায্যে ডিঙিটায় অমরেশবাবুদের সমস্ত মালপত্র তুলিয়া লইল। বিছানাটা দুই হাতে ফাঁড়িয়া তাহার মধ্যে কিছু মূল্যবান জিনিস আছে কি না দেখিয়া লইয়া জলে ফেলিয়া দিল। বুলু চেঁচাইয়া উঠিল—ওটার মধ্যে আমার যে স্কিপিং রোপ্‌টা ছিল, মা।

গণেশ বলিল—মিছিমিছি কেন দেরি করছেন? শেষকালে যে গায়ে আমাদের হাত তুলতে হবে। বলিয়া গণেশ সত্য-সত্যই তাহার ডান হাতটা বুলুর মায়ের দিকে বাড়াইয়া দিল।

অমরেশবাবু তাঁহার লাঠিগাছটি তুলিয়া হাঁকিয়া উঠিলেন—খবরদার!

অমনি বজ্রের মত গণেশ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল—ঐ একটা লাঠি নিয়ে কী আপনি ভয় দেখাচ্ছেন? আপনার একটা মাত্র লাঠি—আর আমাদের নৌকোর তলায় রাম-দা, কুড়ুল, খন্তা—এমন-কি একটা পিস্তল পর্যন্ত আছে। কাউকে সহজে খুন করতে আমরা চাই না, কিন্তু একটু কিছু বাধা দিলেই দা তুলে ঘাড় বাড়িয়ে বেমালুম কোপ দিয়ে বসব। আর এক কোপেই সাবাড়। বলিয়া আবার সে হাসিয়া উঠিল।

অমরেশবাবু চোখে-মুখে আর পথ দেখলেন না। হাতের লাঠিটা নিস্পন্দ হইয়া রহিল। করুণ আর্তকণ্ঠে কহিলেন—আমাদের তোমরা এমনি করেই মারবে নাকি?

গণেশ রাম-দাটা ততক্ষণে হাতে তুলিয়া লইয়াছে। মুখভঙ্গি করিয়া কহিল—একেবারেই মারব না। গয়নাগুলো খুলে দিন, সামনের ঐ চরে আপনাদের পৌঁছে দেব। দেখতে পাচ্ছেন না ঐ চর? এমনি ঝড়ে ডুবলেও ত' জিনিসপত্রগুলি আপনাদের যেত! আর, শুভেলাভে চরে যে পৌঁছে দেব তার জন্যে সামান্য ঐ গয়নাগুলো আমাদের বক্‌শিস দেবেন না? তা কি হয়? দিন। ঝড় পড়ে' গেছে—এখুনিই চার-দিক থেকে কাতারে-কাতারে নৌকো এসে পড়বে। দেরি করবেন না! বলিয়া গণেশ রাম-দাটা শূন্যে একবার চালনা করিল।

অগত্যা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মা গা হইতে গয়নাগুলি খুলিয়া দিতে লাগিলেন। কানের দুল দুইটি পর্যন্ত গণেশের চোখ এড়াইল না।

গয়নাগুলি কোঁচড ভরিযা তুলিয়া লইয়া গণেশ এইবার বুলুর দিকে অগ্রসর হইল। বুলু ভয় পাইয়া বাবাকে জডাইয়া ধরিল। গণেশ কহিল--কিচ্ছু ভয় নেই, খুকি। তোমাকে আমি মারব না। তোমার গলা থেকে হার-ছডাটা খুলে দিলেই আমি খুসি। বিযের সময কত হাব পাবে।

বুলু মাথা নাডিযা কহিল—ককখনো দেব না।

গণেশ কহিল—না দিলেই ত' বিপদ। তোমাব বাবার মুণ্ডুটা আলাদা হয়ে যাবে।

মা বললেন—দিযে দে বুলু।

সনাতন বলিল—তোমাব বাবা প্রাণে বাঁচলে কত হার গডিযে দিতে পারবেন। তোমার মা দেখ ত' কত ভাল—চাওযা-মাত্র দিয়ে দিলেন। কথা শোন খুকি, নইলে জলেব মধ্যে তোমাকে ছুঁডে ফেলে দেব কিন্তু।

বুলু কিছুতেই হাব দিবে না। সে মুখ ঝাম্‌টাইয়া বলিয়া উঠিল—পথে আসতে এত করে' ওঁদের গুষ্টি-শুদ্ধু চিঁডের মোয়া, ডাবের জল খাওয়ান হ'ল আর এখন কিনা উল্‌টে গয়না চাইতে এসেছেন!

গণেশ হাসিযা বলিল—সেই জন্যেই ত' নৌকোটা তখন নদীতে ডুবিয়ে দিই নি। পরের উপকার কিছু-কিছু আমরাও করতে জানি, খুকুমণি। এখন একবার এস ত' এদিকে।

বুলু বাবাকে আরো জোরে আঁকডাইয়া ধরিল। গণেশ হঠাৎ বাঁ হাতে বুলুর গলা টিপিযা ধরিল, নির্মম কণ্ঠে কহিল—হার না ছাডলে গলা টিপে মেরে ফেলব, বলছি।

বুলু প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে মা-ও। অমরেশবাবু ধমক দিয়া উঠিলেন—ছাড গলা। হার খুলে দিচ্ছি।

গণেশ তবুও গলা ছাডিল না, বুলুও সেই উদ্ধত হাতটাকে আঁচড়াইয়া কামডাইয়া রক্তাক্ত করিয়া দিতেছে। মা গণেশের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছেন। গণেশ বলিতেছে—হার না ছাড়লে এই দা তোমার মাথায় পড়বে।

মুহূর্তে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া অনিল বাবার হাত হইতে ছড়িটা তুলিয়া লইয়া তাহার মোটা মাথাটি দিয়া গণেশের মাথায় ভীষণ জোরে এক ঘা বসাইয়া দিল। অমনি চোখের পলকে সনাতন তাহাকে ঠেলা মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

মা অবুঝের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বুলু এইবার অনায়াসে হার ছাড়িয়া দিল। অমরেশবাবু ছেলেকে উদ্ধার করিবার জন্য জলে ঝাঁপাইতে যাইতেছিলেন, গণেশ বাধা দিয়া কহিল—আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। যা হরলাল, ছোঁড়াটাকে ডিঙিতে তুলে নে।

সনাতন বলিল—যা বলেছিস্। আসামের চা-বাগানে ছোঁড়াটাকে চালান দিলেও ত' দু'পয়সা হ'তে পারে। বলিয়া কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া সে-ও জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আর এই মেয়েটাকেই বা ছাড়ি কেন? বলিয়া সঙ্গের আর এক মাঝি—নাম হরলাল—সহসা বুলুকে পাঁজা-কোলে করিয়া সামনের ডিঙিটার উপর লাফাইয়া পড়িল। বুলুকে সেইখানে রাখিয়া আবার আসিয়া সে নৌকার বৈঠা ধরিয়াছে।

বুলু অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনি মিলিল মা ও বাবার সম্মিলিত আর্তকণ্ঠে। আর কোথাও কাহারো এতটুকু সাড়া মিলিল না।

নদী তখনো উত্তাল, শোঁ শোঁ করিয়া জোরে হাওয়া বহিতেছে—যেন কোন সন্তানহারা জননী তার হারান সন্তানকে খুঁজিয়া ফিরিতেছে—আকাশ পিচ-এর মত আবার কালী করিয়া আসিল। আর দেখিতে দেখিতে অমরেশবাবু ও তাঁর স্ত্রীর চোখের সম্মুখ দিয়া পাৎলা ছিপছিপে ডিঙিটা তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি লইয়া উধাও হইয়া গেল।

শুধু বাক্স-প্যাট্রা নয়—তাঁদের দুইটি মাত্র সন্তান—অনিল আর বুলু। টাকা-কড়ি গয়না-পত্র সমস্ত উজাড় করিয়া দিয়াও তাহাদের ফিরিয়া পাওয়া গেল না।

—মাঝি, এদের নিয়ে গিয়ে তুমি কি করবে? ওরা তোমার কাছে কী দোষ করেছে? দুই হাতে কপালে আঘাত করিতে-করিতে মা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অমরেশবাবুর শোক করিবার সময় নাই। তিনি আঁজলা ভরিয়া জল তুলিয়া স্ত্রীর কপালে-মুখে ছিটাইতে লাগিলেন।

গণেশ খুব জোরে বৈঠা টানিতে লাগিল। সামনেই নতুন একটা চর জাগিয়াছে, দেখিতে-দেখিতে নৌকা আসিয়া সেখানে ঠেকিল। গণেশ বলিল—নামুন এবার নৌকো থেকে। ডাঙায় উঠে যত পারুন স্ত্রীকে সেবা করুন বসে' বসে'।

অমরেশবাবু মিনতি করিয়া কহিলেন—ছেলে-মেয়ের শোকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন—কী করে নামাব?

গণেশ কহিল—বেশ, আমি পায়ের দিকটা ধরছি, আপনি মাথার দিকটা ধরুন। এখুনি চোখ চাইলেন বলে'।

ধরাধরি করিয়া বুলুর মাকে নামান হইল।

গণেশ কহিল—এই লণ্ঠনটা রাখুন। পকেটে দেশলাই আছে আপনার? নেই? তবে নিন্ আমারটা। বৃষ্টিতে কিছু আর ওর আছে নাকি? বলিয়া অনেক কষ্টে সে একটা কাঠি ধরাইল।

অমরেশবাবু বলিলেন—কী করব দেশলাই নিয়ে?

কী করব দেশলাই নিয়ে! গণেশ মুখভঙ্গি করিয়া উঠিল, তাও আমাকে বলে' দিতে হ'বে নাকি? কী বুদ্ধি আপনার! নইলে কি কমলাঘাটা আসতে আউটসাহি আসেন? নতুন মানুষ সঙ্গে একটা চেনা লোক নিয়ে আসতে নেই? যাক্, লণ্ঠনটা জ্বালুন। না, তাও আমাকে জ্বেলে দিতে হ'বে?

অমরেশবাবু ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

গণেশ বলিল—লণ্ঠনটা জ্বেলে হাতে করে' শূন্যে নাড়তে থাকুন। ঐ রকম নাড়তে থাকলে নৌকোর মাঝি কেউ বুঝতে পারবে যে ভীষণ কোন বিপদে পড়েছেন। সাহায্য করতে আসতে পারে। নিন্, আমার সময় নেই। ডিঙিটা গিয়ে ধরতে হ'বে।

অমরেশবাবু লণ্ঠন হাতে লইয়া মিনতি করিয়া কহিলেন—কিন্তু ওদের ওরা নিয়ে গেল কেন? ওদের তুমি ফিরিয়ে দিয়ে যাও, তোমাকে আরো অনেক টাকা দেব—যা তুমি চাও।

গণেশ ততক্ষণে তার নৌকাতে গিয়া বসিয়াছে। বৈঠায় টান মারিয়া কহিল—টাকার কথা বলবেন না, হয়ত' রাত বেশী হ'লে আবার একবার ডাকাতি করতে আসব। এখন স্ত্রীকে কোন রকমে ভাল করে' তুলুন।

মূর্ছার মধ্যেই মা গোঙাইয়া উঠিলেন—ওদের তুমি ফিরিয়ে দিয়ে যাও মাঝি।

গণেশ বৈঠা টানিতে টানিতে কহিল—বাড়ী ফিরে যদি পুলিশে না খবর দেন ত' ছেলে-মেয়ে আপনাদের একদিন ফিরে আসতেও পারে। আর যদি দেখি পেছনে আমাদের পুলিশ লেগেছে তা হ'লে ওদের কাটামুণ্ডু দুটো একদিন আপনাদের বাড়ীতে গিয়ে উপহার দিয়ে আসব। মনে থাকে যেন—বলিয়া নৌকা লইয়া সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

আকাশে আবার দুর্যোগের নূতন আয়োজন শুরু হইয়াছে। অমরেশ-বাবু লণ্ঠন তুলিয়া শূন্যে দুলাইতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও কোথাও দেখা গেল না।

শুধু নদী ও মাঠ ভেদ করিয়া দুইটি অসহায় শিশুর ক্ষীণ স্বর তাঁহার কানে বাজিতে লাগিল।

সাঁ সাঁ করিয়া নৌকা চালাইয়া গণেশ ডিঙিটা ধরিয়া ফেলিল। বলিল—আটকাজুরির খালের মধ্যে দিয়ে পালাতে হ'বে। খোলা নদীতে বেশীক্ষণ আর থাকা নয় এখন। কোথা দিয়ে কে এসে পড়ে' কিছু ঠিক নেই।

খালের মুখে ডিঙি ঠেলিয়া সনাতন কহিল—প্রকাণ্ড দাঁও মারা গেছে আজ।

হরলাল কহিল—ট্রাঙ্ক-বাক্স ত' সমস্তই—এমন কি দুটো জ্যান্ত প্রাণী পর্যন্ত শিকার করা গেছে। বলিয়া সে একবার অনিলের দিকে তাকাইল, কহিল—কি বাছাধন, আর আসবে ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করতে?

পাল টাঙাইবার মোটা একটা কাছি দিয়া সনাতন অনিলের হাত-পা কোমর-গলা খুব আঁট করিয়া কষিয়া বাঁধিয়া তাহাকে এক কোণে ফেলিয়া

রাখিয়াছে। পরণের জামা-কাপড় ছেঁড়া, খোলা নদীর উপর শীতে হি-হি করিতে করিতে সে হাঁটু দুইটিকে বুকের মধ্যে গুটাইয়া একটা পুঁটুলির মত গোল হইয়া পড়িয়া রহিল। একটা কথা বলিতে যাইবে কি অমনি মাথার উপর ডাণ্ডার বাড়ি মারিয়া মাথাটা তাহার গুঁড়া করিয়া দিবে বলিয়া সনাতন শাসাইযাছে। চীৎকাব করিয়া কোন লাভ নাই।

গণেশ বলিল—কিন্তু ঐ মেয়েটাকে শুধু-শুধু তুলে আনলি কেন? ওকে আবার কোন্ কাজে লাগবে? তোদের যেমন সব বুদ্ধি!

সনাতন বলিল—ছোঁড়াটা কাজে লাগলে ও-ই বা এমন কি ফ্যালনা হবে? কৈজু-পেশোয়ারির কাছে বিক্রি করে' দিলে মোটা পয়সা পাওয়া যাবে। তালতলা হাটের ফজলকে সেই মনে নেই তোর? ঝুলির মধ্যে দেখি তার পাঁচ মাসের একটা মেয়ে। কোথা থেকে হাত সাফাই করে' এনেছে। বললে, দাম পাবে নাকি পঁচিশ টাকা।

হরলাল বলিল—পাঁচ মাসের মেয়ের দাম পঁচিশ টাকা হ'লে আট বছরের মেয়ের দাম কম করে' দুশো টাকা হবে। ফজলকে বললেই সে রাজি হয়ে যাবে। সে আমাকে ত' বলছিলও সেদিন—দু' একটা জ্যান্ত জিনিস আনতে পারিস না আমার জন্যে? এই ব্যবসাই বা মন্দ কি, গণেশ!

বুলুর হাত-পা খোলা, ডিঙিটার উপর বসিয়া এতক্ষণ সে মা মা বলিয়া তারস্বরে চেঁচাইতেছিল, কিন্তু হরলালের এক প্রবল চড় খাইয়া তাহাকে কান্না থামাইতে হইয়াছে। ভয়ার্ত চক্ষু মেলিয়া সে মাঝিদের বিশাল চেহারার দিকে একবার তাকায়, আর মা'র কথা মনে করিয়া এক-একবার ফুঁপাইয়া উঠে। কোথায় তাহারা চলিয়াছে—মা-বাবা কোথায় পড়িয়া রহিলেন, কী কুক্ষণেই তাঁহারা গ্রাম দেখিতে কলিকাতা ছাড়িয়াছিল! ভগবানকে ডাকিবার কথা বুলুর আর একবারও মনে হইল না। এত ডাকিবার পর তিনি কি না ডাকাত হইয়া তাহাদের সমস্ত-কিছু লুট করিয়া নিলেন!

গণেশ বুলুর দিকে তাকাইল—অন্ধকারে সে-মুখের আভাসে কি একটা অস্পষ্ট স্মৃতি তাহার বুকের মধ্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বছর পাঁচেক আগে এ-অঞ্চলে যে ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছিল তাহাতে তাহার

ঘর-বাড়ি-গোয়াল-গরু সমস্ত কিছু জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল—সঙ্গে-সঙ্গে তাহার স্ত্রী ও বুকে তাহার তিন বছরের কচি মেয়ে টগর। জোয়ান গণেশ ভাসিতে-ভাসিতে একটা গাছের উপর আশ্রয় লইয়া রক্ষা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু বিশাল ফেনিল জলরাশির মধ্যে তাহার স্ত্রী ও মেয়ের চিহ্নটুকুও কোথাও আর খুঁজিয়া পায় নাই। ভাগ্য তাহাকে যে নির্মম আঘাত দিয়া পথে বসাইয়াছে গণেশ ঠিক তাহার প্রতিশোধ নিতেই হাতে খড়্গ বল্লম সড়কি পিস্তল বর্শা নিয়া ডাকাত সাজিয়াছে। চোখে তাহার জল নাই, মনে মমতার এতটুকু বাষ্প নাই—সে বজ্রের মত কঠিন! কিন্তু মাতৃহারা বুলুর মলিন মুখখানির দিকে চাহিয়া এতদিন বাদে বুকটা তাহার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। হাতের বৈঠা হঠাৎ শিথিল হইয়া পড়িল।

গণেশ কহিল—না, হাতে ধরে' মেয়ে আমি কাউকে বেচতে পারব না কক্‌খনো।

সনাতন বলিল—তবে কী করবি এ মেয়ে নিয়ে?

গণেশ গম্ভীর হইয়া বলিল—তাই ত' ভাবছি। কেন যে শুধু-শুধু এই হাঙ্গাম বাধালি?

বুলু তখন নদীর জলে পা ডুবাইয়া বসিয়াছে। অন্ধকারে তার বড় বড় চক্ষু দুইটি মণির প্রদীপের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল—আমাকে তার চেয়ে মা'র কাছে রেখে এস না। হার ত' আমার কেড়েই রেখেছ, আমাকে ধরে' নিয়ে গিয়ে কি করবে?

হীরলাল দাঁত বাহির করিয়া বলিল—তোমাকে কেটে-কুটে কালিয়া রেঁধে খাব, এবার।

পা দিয়া জল ছিটাইতে ছিটাইতে বুলু কহিল—সে ত' অনেক দেরি। তার আগে আমাকে কিছু খেতে দাও না। সেই কোন্ দুপুরে চারটি ভাত খেয়ে বেরিয়েছিলাম। চিঁড়ের মোয়াগুলো ত' তোমরাই সব সাবাড় করলে। এখন কিনা আমার মাংস খেতে চাও! আর আমার বুঝি খিদে পায় নি।

বুলুর কথা শুনিয়া মাঝিরা হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। নদী ছাড়িয়া নৌকা দুইটি তখন আটকাজুরির খালে পড়িয়াছে। খালটা সংকীর্ণ বটে, কিন্তু শানানো ছুরির ফলার মত ধারাল স্রোত। দুই পাড়ে ঘন বন—অন্ধকার আকাশের

সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া আছে। এই বিশাল অরণ্যের কারাগার হইতে হাওয়া যেন বাহিরে আসিবার পথ পাইতেছে না, দিকে-দিকে অন্ধ আর্তনাদ করিতেছে। বুলুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। ডাকিল—দাদা!

অনিল সাড়া দিল না। মড়ার মত পড়িয়া রহিল।

বুলু কহিল—দাদাকেও খেতে দাও চারটি। আমাদের এত সব জিনিস নিয়ে গেলে, আর দু'টি ভাত খেতে দেবে না? এও কি হয়?

গণেশ বাঁ হাতে তার কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল। মন তাহার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। যতই সে ভাবে শিশুর এই প্রলাপে সে কান পাতিবে না, ততই তার মন উদাস হইয়া উঠিতে থাকে। কি যে করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারে না।

হরলাল বলিল—সোনার থালায় করে' তোমাদের দু'জনকে রাজভোগ খেতে দেব, চল না।

হরলাল যে ঠাট্টা করিতেছে তা বুলু বুঝিল, বলিল—তবে আমাদের দু'জনকে উপোস করিয়ে রাখবে? তোমরা সবাই মিলে ফুর্তি করে' খাবে-দাবে, আর আমাদের দেখে তোমাদের মায়া হবে না?

সনাতন হুঁকা সাজাইয়া টান দিতেছিল। মুখ তুলিয়া কহিল—মায়া না হাতী! বল্লাম না দু'জনকে কেটে-কুটে কালিয়া বানাব।

বুলু কহিল—মানুষের মাংস বুঝি মানুষে কখন খায়? এমন কথা বইয়ে ত' কোনদিন পড়ি নি।

গণেশ আগ্রহের সঙ্গে কহিল—তুমি আবার বই পড়তে পার নাকি খুকি, তাহলে?

মাথার সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড়ের উপর হইতে বব্‌ড্-করা চুল দুলাইয়া বুলু কহিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, দস্তুরমত সেভেন্‌থ্ ক্লাশ—বাবা মিছিমিছি এক ক্লাশ নীচে ভর্তি করে' দিলেন। তা, তোমরা যদি আমাকে ছেড়ে দাও—আমি এবার ঠিক ডবল প্রমোশন্ নেব।

মাঝিদের কাহারো মুখে কোন কথা আসিল না।

বুলু ঘাড় হেলাইয়া কহিল—শুধু বই পড়া-ই নয়—আমি আবার এস্রাজ বাজাতে পারি। জান না বুঝি? রোজ শুক্রবার আমাদের গানের ক্লাশ।

ঐ যে কাঠের বাক্সটা নিয়ে যাচ্ছ, ওটার মধ্যেই ত' আমার এস্রাজ—দাদার এয়ার-গান—সব আছে। চাবি ত' আর মা'র আঁচল থেকে বুদ্ধি করে নিয়ে আস নি—নইলে বাক্সটা খুলে তোমাদের দুটো গৎ শুনিয়ে দিতাম।

গণেশ অনেক ডাকাতি করিয়াছে, খুন জখম করিতে কোনদিনই তার হাত কাঁপে নাই, দাঙ্গা-লড়াইয়ে সে একজন সেরা ডাকসাইটে গুণ্ডা—তাহার দস্যু-জীবনে এমন উৎপাত জুটে নাই কখন। আজ তাহার নিজেকে কেমন যেন অবসন্ন বোধ হইল। চোখ দু'টি ছলছল করিয়া উঠিল। সে হঠাৎ হাতের বৈঠাটা ঠেলিয়া দিয়া কহিল—চাড় দিয়ে বাক্সের ডালাটা খুলে ফেলতে কতক্ষণ? এস্রাজ তুমি বাজাবে খুকি?

বুলু মুখ বাঁকাইয়া কহিল—আহা, কী আব্দার তোমার! মা-বাবাকে এই জল-কাদার মধ্যে কোথায় কোন্ জঙ্গলে রেখে এলে, দড়ি দিয়ে দাদার হাত-পা বেঁধে রেখেছ, আমাকে কিছু খেতে দিচ্ছ না—আর আমি কি না বসে'-বসে' তোমাদের এস্রাজ বাজিয়ে শোনাব!

সনাতন হুঁকায় টান মারিয়া কহিল—কথায় দেখছি ধুরন্ধর! সহরের মেয়ে কিনা।

বুলু জল নিয়া খেলা করিতে করিতে বলিল—তোমাদের বাড়ি আর কতদূর?

গণেশ বলিল—আরো মাইল দুয়েক। জলে পা ডুবিয়ে বস' না খুকি, পড়ে' যাবে।

বুলু কহিল—বাড়ি নিয়ে গিয়ে মাংস কেটে কালিয়া করে' খাবে, তার আবার অত দরদ কিসের? হোক্ না অসুখ। অসুখ করলে দেখব কেমন কেটে ফেলতে পার। তখন নিজেরাই ডাক্তার আনতে ছুটোছুটি করবে। মাকে কাছে না পেলে আমি ভালও হ'ব না। দেখবে তখন মজা! ঠিক হবে। থাকবই ত' পা ডুবিয়ে।

গণেশ হাত বাড়াইয়া বলিল—আমার কাছে এসে বস'।

বুলু চোখ বড় করিয়া বলিল—ও বাবা, তোমার যেমন গোল-গোল চোখ, খ্যাংরার মত গোঁফ, কেলেকুষ্টি চেহারা—সামনে গিয়ে বসি, আর তুমি আমাকে মুখে পুরে আস্ত গিলে ফেল আর কি!

গণেশ হাসিয়া বলিল—না, না, তোমার কিছু ভয় নেই। আমাদের বাড়ি চল, তোমাকে কত জিনিস খেতে দেব, দেখ। জামরুল, বাতাবি লেবু, ছানা, সরভাজা—কত কি!

—ছাই। ওতে পেট ভরবে নাকি? ভাত দেবে না? ইলিশ-মাছ ভাজা দেবে না?

—তাও দেব।

ঠোঁট উল্‌টাইয়া বুলু কহিল—ভারি দেবেন! সমস্ত টাকা-কড়ি গয়নাগাটি কেড়ে নিয়ে একখানা ইলিশ মাছ ভাজা দেবেন। দাদাকেও দেবে ত'? ঠিক?

গণেশ ঘাড় হেলাইয়া বলিল—দাদাকেও।

বুলু জোর গলায় কহিল—তবে ওকে অমনি বেঁধে রেখেছ কেন? ওর লাগে না বুঝি? তোমাকে যদি পুলিশে অমনি বেঁধে রাখে?

গণেশ বলিল—ও তবে শুধু-শুধু আমার মাথায় লাঠির বাড়ি মারলে কেন? দেখ দিকি এখানটা আমার কেমন ফুলে' আছে।

বুলু মুখ ভ্যাঙচাইয়া কহিল—শুধু-শুধু বই কি। উনি আমার গলা টিপে ধরে' হার ছিনিয়ে নিতে চাইবেন, আর ও তোমাকে রসগোল্লা খেতে দেবে! তোমার মাথা ত' একটা লোহার কড়া, ওটায় লাঠি মারলে লাঠিই ভাঙবে। আর দেখ দিকি গলাটা আমার কেমন খিম্‌ছে দিয়েছ! কি ভীষণ জ্বালা করছে দেখ ত'! দুষ্টুমি করলে, মাষ্টাররা পর্যন্ত গায়ে হাত তোলে না, আর তুমি কি না নোখ দিয়ে রক্ত বার করে' দিলে!

গণেশ বলিল—তুমি তবে হার ছেড়ে দিলে না কেন?

—দিয়েছি ত'। তবে এখন আবার আমার হার ফিরিয়ে দাও। আমাকেই ত' ধরে' নিয়ে যাচ্ছ, গলায় আমার হার থাকলে এখন ক্ষতি কি? আমি ত' আর পালাচ্ছিনে।

ট্যাঁক হইতে সোনার সরু হার-ছড়া বাহির করিয়া হাসিমুখে গণেশ বলিল—এস এস খুকুমণি, কাছে সরে' এস। পরিয়ে দি।

এক মুহূর্ত বুলু চুপ করিয়া কি ভাবিল। তারপর কহিল—আগে তবে দাদার বাঁধন খুলে দাও, তবে হার পরব।

গণেশ হুকুম করিল—দড়িটা খুলে দে, হরলাল।

হরলাল দড়ির গিঁট খুলিতে খুলিতে কহিল—মেয়েটার কথায় মন যে তোর ভিজে গেল, গণ্শা। কি করবি তুই ওদের নিয়ে?

গণেশের হঠাৎ যেন চেতনা হইল। সে এতক্ষণ আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধের মত মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করিয়া যাইতেছিল। হরলালের কথা শুনিয়া সে খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল। সত্যই, উহাদের নিয়া সে কী করিবে? ছেলেটিকে অনায়াসে সে চা-বাগানে চালান দিতে পারিবে, কিন্তু মেয়েটিকে সে কোথায় পার করিবে শুনি? বলা কহা নাই, হরলাল যে মেয়েটিকেও আনিয়া নৌকায় তুলিবে গণেশ তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। এমন মেয়েকে বেচিবার মতলব হরলালের মনে কি করিয়া আসিল? ঘাড় পাতিয়া মিছিমিছি এই ঝক্কি সে নিতে গেল কেন?

তাহা ভাবিয়া এখন ফল হইবে না। যা হোক্ একটা ব্যবস্থা কিছু করিতেই হইবে। গণেশ বুলুর মুখের দিকে আর একবার তাকাইল। কিন্তু বুলুর সরল, নির্ভয় ও বিশ্বাসপরায়ণ চোখ দুইটির পানে তাকাইয়া তাহার বুদ্ধি ঘুলাইয়া উঠিল। এই মেয়েকে সে কোথায় লইয়া যাইবে, কাহার কাছে আশ্রয় দিবে, মেয়েটি কোনদিন বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে চাহিলে সহজে সে তাহাকে ছাড়িয়াই বা দিতে পারিবে কি না!

অনিল বাঁধন ছাড়া পাইয়া তক্তার উপর উঠিয়া বসিল। শরীরের মাংসপেশীগুলিতে নিদারুণ ব্যথা করিতেছে, পিপাসায় গলা কাঠ হইয়া আছে, কিন্তু ভয়ে সে একটা কথা বলিতে পারিল না। এতক্ষণ সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, বুলু যে ইহার মধ্যে ডাকাতদের সঙ্গে ভাব করিয়া ফেলিয়াছে তাহা সে টের পায় নাই। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া বুলু তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া সহজ স্বরে কহিল—তোর খুব লেগেছে দাদা? কোথায়? বল্ না, আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

পাছে ডাকাতরা এই অসৌজন্যর জন্য হুঙ্কার দিয়া উঠে, সেই ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া অনিল সরিয়া গেল। বুলু বলিল—বল্ না, কোথায় লেগেছে, হাত বুলিয়ে দিলে ডাকাতরা কিছু বলবে না, দাদা। বলবে নাকি তোমরা? দাদা এখানে শুক্, আমি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দি। বৃষ্টি ত' এখন থেমে গেছে—ঐ মাদুরটা পেতে দাও না।

গণেশ তক্ষুনি মাদুর পাতিয়া দিল। বলিল—শোও খোকা।

বুলু কহিল—দেখলি কেমন ওরা ভাল লোক। বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমাদের পেট ভরে' কত খেতে দেবে বলেছে, গদীর ওপর নরম বিছানা করে' দেবে, পড়বার জন্যে আলো দেবে—দেবে না মাঝি? মাকে চিঠি লিখবার জন্যে টিকিট কিনে দেবে ত'?—দেখলি, সব দেবে। খুব ভাল ওরা। এবার শো। সেই বমির ভাবটা সেরে গেছে ত' এখন?

অনিল তবুও বিমূঢ়ের মত শূন্যে চাহিয়া রহিল। বুলুর এই অনর্গল কথায় ডাকাতরা একটুও প্রতিবাদ করিতেছে না, বরং তাহাকে যেন প্রশ্রয় দিতেছে। উহাদের মুখে আগেকার সেই নিষ্ঠুর কাঠিন্য এখন নাই, কেমন যেন একটা প্রসন্নভাব। বুলুর কথা শুনিয়া মুচকি-মুচকি হাসিতেছে, এমন একটা পরিবর্তন কি করিয়া ঘটিতে পারে অনিল ভাবিতে না পারিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। হয়ত' এই কৃত্রিম ভালমানুষির পিছনে কোন ক্রুর মতলব আছে। নিশ্চয়ই। উহারা ত' ছেলেখেলা করিবার জন্য উহাদের ধরিয়া আনে নাই।

বুলু গলা উঁচু করিয়া কহিল—দাদাকে যে ধরে' নিয়ে যাচ্ছ, তোমাদের ওখানে ইস্কুল আছে? কোথায় তবে ওকে পড়াবে শুনি? আমি মেয়ে—না হয় বাড়িতে বসে' পড়লাম, কিন্তু দাদা নতুন য়্যালজেব্রা শিখেছে—তোমরা শেখাতে পারবে না হাতী! আট-আটে কত হয় বল দিকি? বলিয়া, বুলু খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

গণেশ আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে হঠাৎ চঞ্চল হইয়া কহিল—তোরা ছেলেটাকে নিয়ে এগো, আমি খুকিকে তার মায়ের কাছে রেখে আসছি। ওরা নিশ্চয়ই এখন সেইখান থেকে নড়ে নি। ডাকাতে-নৌকো ছাড়া ও-তল্লাট কেউ মাড়ায় না—

সনাতন অবাক হইয়া কহিল—তুই পাগল হলি নাকি, গণেশ?

হরলাল বলিল—এখন আস্তে-আস্তে অনেক নৌকো বেরুচ্ছে—কে জানে খবর পেয়ে রিভার-পুলিশের দল হয় ত' হানা দিতে বেরিয়ে পড়েছে চারদিকে—ধরা পড়ে' তুই ত' ডুববিই, দল-কে-দল লোপাট হয়ে যাবে। ঐ মেয়েটাই

ডাকাতের হাতে

জন্তে ভাবিস কেন? সামনের অমাবস্যা-রাত্রে চণ্ডীর মন্দিরে যে একটা নর-বলি দিতে হ'বে, মনে নেই।

চুল হইতে পায়ের নখের ডগা পর্যন্ত গণেশের কাঁটা দিয়া উঠিল। উহাদের কথা উপেক্ষা করিয়া সে বুলুকে কহিল—যাবে খুকি, মায়ের কাছে ফিরে যাবে তুমি?

বুলু খুসিতে লাফাইয়া উঠিল—দাদা? দাদাকেও আমাদের সঙ্গে নেবে?

গণেশ বলিল—না। ওসব কেন? ও নয়—তুমি একলা চল। তোমাকে আমাদের দরকার নেই। তোমাকে কোথায় রাখব, কে তোমাকে দেখবে?

বুলু বলিল—দাদাকেই বা কে দেখবে শুনি? মা সঙ্গে না থাকলে কে ওর জামায় বোতাম, জুতোয় কালি লাগিয়ে দেবে শুনি? দাদাকে না নিলে কক্খন আমি যাব না—না, কক্খন না। আমি কাছে না থাকলে কে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে? আমি চলে' গেলে ও কাঁদবে না একা-একা?

বুলু অনিলের গা ঘেঁসিয়া সরিয়া বসিল, ফের কহিল—আমাদের তু' জনকেই মা-বাবার কাছে রেখে এস। হার আবার তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। তোমার ঠিকানা দাও মাঝি, বড় হ'য়ে আমি যখন লেডি-ডাক্তার হ'ব তখন তোমাকে আরো তু'ছড়া হার পাঠিয়ে দেব। মুক্তোর নেক্‌লেস। তোমার মেয়েকে পরতে দিয়ো। কেমন?

গণেশ তুই হাত বাড়াইয়া দিয়া ডাকিল—তোমাদের তু'জনকেই ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

সনাতন গর্জিয়া উঠিল—তুই ক্ষেপলি নাকি? আবার য্যাদ্দুর পাড়ি দেওয়া? মায়া যে আর ধরে না দেখছি।

গণেশ বলিল—কী করব তবে ওদের নিয়ে?

হরলাল কহিল—তার চেয়ে ছুঁড়িটাকে জলের মধ্যে ফেলে দে না। যাক ভেসে যেখানে খুসি। ছোঁড়াটার জন্তে ভাবনা কি? কচি মুণ্ডুর রক্ত পেলে মা-কালী খুসি হ'বেন।

ঠিক—মেয়েটাকে সে জলের মধ্যেই ফেলিয়া দিবে। তাহা হইলেই এক নিমিষে সমস্ত চিন্তা-ভাবনার সমাধান হইয়া যাইবে। একটা এক-ফোঁটা পুঁচকে মেয়ের মিষ্টি কথা শুনিয়া সে গলিয়া যাইতে বসিয়াছে। ইহার চেয়ে

কত নৃশংস কাজ সে করিয়াছে—সেবার ট্রেনে ডাকাতি করিতে যাইয়া কোন্ মা'র কোল হইতে ঘুমন্ত ছেলে ছিনাইয়া লইয়া জানলা দিয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া দিয়াছিল, বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া কত বাড়ি সে পুড়াইয়া দিয়াছে—ভিতরে মিলিত শিশুকণ্ঠের কাতর আর্তনাদেও সে বিচলিত হয় নাই—আর আজ কোথাকার কে একটা একরত্তি মেয়েকে জলে ঠেলিয়া ফেলিতে তার হাত উঠিবে না !

মেয়েটিকে দূর না করিয়া না দিলেও বা তার পথ কোথায় ? উহাকে সারা জীবন তাহার ঘাড়ে করিয়া বেড়াইতে হইবে নাকি ? মায়ায় পড়িয়া শেষকালে ডাকাতি ছাড়িয়া সে সন্ন্যাসী সাজুক আর কি ! একটা তুচ্ছ মেয়ের কাছে কখনই গণেশ হার মানিবে না।

একবার করুণ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবে, হয় ত' ঢেউয়ের উপর কচি-কচি দু'টি কোমল মুঠি তুলিয়া একবার মাকে আহ্বান করিবে—কিন্তু অতল জল ছাড়া কেহই তাহাকে আশ্রয় দিতে আসিবে না—তার পর সব চুপচাপ, আকাশ ভরিয়া মেঘের তেমনি গুরুগুরু, বন কাঁপাইয়া হাওয়ার তেমনি শোঁ শোঁ আওয়াজ। এক মুহূর্তে সব শেষ হইয়া যাইবে।

গণেশ ভাল করিয়া কোমর বাঁধিল। বলিষ্ঠ দেহের পেশীগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল, চক্ষু দু'টা আগুনের গোলার মত ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে।

বুলু তাড়াতাড়ি ডিঙির ধারে সরিয়া তেমনি পা দিয়া জল ছিটাইতে ছিটাইতে কহিল—আমাকে জলে ফেলে দেবে, মাঝি ? আর দাদা ?

গণেশ ক্ষণেকের জন্য থামিল। অনিলও তাড়াতাড়ি ধারে সরিয়া আসিয়া কহিল—আমিও তা হলে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

গণেশ গর্জিয়া উঠিল—ধর ছোঁড়াকে। ওটাকে চণ্ডীর কাছে দিতে হ'বে, আর মেয়েটাকে লাথি মেরে দেব জলে ঠেলে। জয় মা চণ্ডীকে। বলিয়া গণেশ নৌকা হইতে ডিঙিটার উপর বাঘের মত লাফাইয়া পড়িল।

হরলাল হাতের কাছে পাইয়া অনিলকে সাপটাইয়া ধরিল, কহিল—কোথায় ঝাঁপ দেবে বাছাধন ? জলে নয় চাঁদ, মা-কালীর কাঠগড়ায়।

—রাখ্ ওটাকে শক্ত করে' ধরে'। গণেশ হুঙ্কার দিয়া উঠিল।

বুলু কাঁদো কাঁদো গলায় কহিল—হ্যাঁ, দাদাকে ফেলে দিয়ো না। দাদা

বড় হ'লে এরোপ্লেনে চড়ে বিলেতে যাবে—কত দেশ ঘুরে এসে মাকে গল্প শোনাবে—ওকে ফেলে দিয়ো না, মাঝি। পরে অশ্রু-ভরভর ব্যথিত চোখ দু'টি গণেশের মুখের পানে তুলিয়া সে আবার বলিল—দাদা বড্ড কাঁদছে, ওকে আমি একটু বুঝিয়ে বলি। আর একটুখানি দাঁড়াও না—একটুখানি। তুমি এত ভাল। জল ত' আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

গণেশ বিশাল দেহ মেলিয়া পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আলগোছে সরিয়া দাঁড়াইল। বুলু অনিলের কাছে সরিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল—তুই কাঁদছিস কেন দাদা। আমাকে জলে ফেলে দিলে ঠিক ভাসতে-ভাসতে আমি চরে গিয়ে ঠেকব—যেখানে মা-বাবা লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমাদের জন্যে বসে' আছেন। তোকে ফেলে দেয়নি শুনে তাঁরা কত সুখী হবেন বল্ ত' ?

হরলালের কর্কশ মুষ্টি থেকে ছাড়া পাইবার জন্য অনিল নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছে আর মর্মভেদী কাতর স্বরে বলিতেছে—না, আমাকে বুলুর সঙ্গে জলে ঠেলে দাও। ওর সঙ্গে ভাসতে-ভাসতে আমিও যাব মা'র কাছে। আমিও।

হরলাল তাহাকে শক্ত করিয়া তক্তার সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—থাম্ শূয়োর। একগুঁয়ে কোথাকার।

বুলু কাঁদিয়া ফেলিযা কহিল—দাদাকে মারছ কেন ? আমি চলে' গেলে দাদাকে তোমরা মেরো না, মাঝি। ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে' দিয়ো। দেখো ঠিক ও ফার্ষ্ট হবে। বাড়ি নিয়ে গিয়ে ওকে খেতে দিতে ভুল না যেন।

পরে গলার হার-ছড়া খুলিয়া ফের বুলু বলিল—নাও। ও-নিয়ে আর আমি কি করব ?

সনাতন হাত বাড়াইয়া কাড়িয়া লইল। গণেশ গর্জিয়া উঠিল—না, থাক গলায় হার। খবরদার, ছুঁসনে সনাতন।

বুলু কহিল—তার চেয়ে ট্রাঙ্ক থেকে আমার শুকনো একটা ফ্রক বার করে' দাও না মাঝি। বৃষ্টিতে একদম ভিজে গেছে। আমার ভারি শীত করছে যে। জল লাগলে আরো শীত করবে। কাঠের বাক্সটার মত ট্রাঙ্কটাও খুলে ফেল না।

গণেশ নিঝুমের মত দাঁড়াইয়া আছে।

—দাও না। ট্রাঙ্কে মা'র অনেক স্নো-পমেটমও দেখতে পাবে। যাবার

আগে তা-ও একটু মেখে যাই না। কেন আর দেরি করছ? দাদা যে খালি কাঁদছে—

গণেশের কঠিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ক্রমে-ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল, মূর্ছিতের মত সে ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া দুই ব্যগ্র হাতে বুলুকে জড়াইয়া ধরিল, ধরা গলায় কহিল—চল খুকুমণি, তোমাকে সুন্দর করে' সাজাব, চল।

ঝাঁঝাল গলায় হরলাল কহিল—আবার তুই গলে গেলি নাকি?

সে কথায় কান না দিয়া গণেশ বুলুকে আরো কাছে আকর্ষণ করিয়া কহিল—জল থেকে পা তোল—মা'র ট্রাঙ্কে তোমার জুতো নেই?

বুলু ঘাড় ফিরাইয়া গণেশের চোখে জল চিকচিক করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। কহিল—দাদাকে আগে ও ছাড়ুক, তবে পা তুলব।

গণেশের কঠোর চাহনির ইঙ্গিত পাইয়া হরলাল অনিলকে ছাড়িয়া দিল।

সনাতন বলিল—হ্যাঁ, মিছিমিছি জলে ফেলে দিয়ে লাভ কি? ফজলুর হাতে ছেড়ে দিলে বরং কিছু ঘরে আসবে।

গণেশ বুলুর চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে সায় দিয়া কহিল—হ্যাঁ, তাই ভাল। তাই ভাল, না খুকুমণি?

বুলু হাসিয়া বলিল—ফজলু? কে সে? খুব ফজলি আম খেতে দেবে বুঝি আমাদের? বাঃ, তবে ত' ভালই হ'বে।

অনেক খাল-নদী পার হইয়া কোথা দিয়া কোথায় আসিয়া যে নৌকা লাগিল অনিলের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। পাড় হইতেই জঙ্গল শুরু হইয়াছে—সে অরণ্য যেমন গভীর ও ঘন, অন্ধকারও তেমনি। দুই চোখের পাতা শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিয়া যদি ভাবা যায় ইহজীবনে চোখ আর খুলিবে না—এই অন্ধকারই চিরকালের জন্য অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে—তেমনি অসহায়ের মত অনিল সেই দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া হাঁপাইয়া উঠিল।

গণেশ আগে নামিল। কহিল—এবার খানিকটা হাঁটতে হবে খুকি।

বুলু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে? বল কি? কুমীর ছেড়ে বাঘে এবার খেতে আসুক আর-কি!

গণেশ কহিল—না, না, তোমাকে আমি কাঁধে করে' নিয়ে যাব, এস।

গণেশের হাত ধরিয়া বুলু নামিয়া আসিল। কহিল—আর দাদা?

—ও ওদের সঙ্গে আসবে'খন। আমি এগোই, সনাতন। গিয়ে মাধব আর গুপীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোরা জিনিসগুলো তোল—এর পর আজকে আর বেরুবার কাজ নেই।

বুলু মাথা নাড়িয়া কহিল—না, দাদাকেও কাঁধে না নিলে আমি যাব না তোমার সঙ্গে।

গণেশ কহিল—হ্যাঁ, দাদাকেও নেবে বৈকি। দাদাকেও কাঁধে তুলে নিস, সনাতন।

সনাতন মাল-পত্রগুলি গুছাইতে-গুছাইতে কহিল—হ্যাঁ, হাওয়া-গাড়ি করে' নেবে! পরে অনিলের পিঠে পা দিয়া জোরে এক ঠোক্কর মারিয়া কহিল—নে ছোঁড়া, আমাদের সঙ্গে জিনিসগুলো নামা। আবার আরেকটা লাথি মারিয়া কহিল—লাথি খেয়ে শিরদাঁড়া মজবুত কর, আমাদের সঙ্গে মোট বইতে হ'বে।

বুলু ভয়ে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেই গণেশ তাহাকে এক ঝট্‌কায় কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অনিল চেঁচাইয়া উঠিল—বুলু!

নিস্তব্ধ অরণ্যে তাহার কোন প্রতিধ্বনি মিলিল না। চোখের সম্মুখে বিরাটকায় অচল পর্বতের মত কঠিন অন্ধকার প্রকাণ্ড একটা হাঁ মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

কতক্ষণ পরেই দুইটি ছেলে আসিয়া হাজির হইল। সনাতন কহিল—এসেছিস, মাধব? বাদলা পেয়ে একচোট ঘুমিয়ে নিচ্ছিলি বুঝি? পাড়ে বসে' পাহারা দিতে পারিস না?

ছেলে দুইটি নৌকার কাছে আসিতেই অনিল দেখিল ইহাদের বয়স অপেক্ষাকৃত কিছু কম। ইহাদের দেখিয়া তত ভয় করে না। ডাকাতিতে থাকিয়া ইহারা এখনও তত ঝুনা হয় নাই, মুখের ভাবে কোথায় যেন একটু কমনীয়তা কাছে।

উহারা আসিতেই অনিলের মনে হইল বুলু তাহা হইলে নির্বিঘ্নে গিয়া

পৌঁছিয়াছে। সর্দার মাঝির কাছে খবর না পাইলে তাহারা আসিল কি করিয়া?

মোট-ঘাট সব নামান হইল। হাতে একটা জ্বলন্ত মশাল লইয়া সনাতন পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিয়াছে। অনিলের মাথায়ও একটা স্যুটকেস্ চাপান হইয়াছে। তাহাদের জিনিস কিনা, তাহাকেই ডাকাতের বাড়িতে নিরাপদে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

হরলাল বলিল—সব চেয়ে হাল্‌কা বাক্সটা তোকে দিলাম, তাই কিনা তুই বইতে পারছিস্ না? ঘাড়টা যে একেবারে দুম্‌ড়ে পড়েছে। সোজা কর মাথা, বলিয়া তাহার কাঁধের উপর এক রদ্দা বসাইয়া দিল। ফের কহিল—এত ননীর দেহ করে' থাকলে চলবে না বাপধন, ঘাড়ের ওপর খাঁড়া চালিয়ে দেব বলছি।

দুই হাত তুলিয়া মাথার উপরে স্যুটকেসের ডালাটা অনিল নাগাল পায় না, তবু হাঁপাইতে-হাঁপাইতে সকলের পিছে-পিছে অতিকষ্টে সে চলিয়াছে। দুই হাত তার জোড়া—গাল বাহিয়া যে অজস্রধারে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে তাহা মুছিবার পর্যন্ত তাহার উপায় নাই।

চলিতে-চলিতে ইচ্ছা করিয়াই গুপী থামিয়া পড়িল। অনিল কাছে আসিতেই গুপী কহিল—বইতে পারছিস না? এই নে, আমি নীচু হচ্ছি—আমার মাথায় ট্রাঙ্কটার ওপর তুলে দিতে পারবি? দেখিস।

অনিল ইতস্তত করিতেছিল, হঠাৎ মাধব তাহা দেখিতে পাইয়া কহিল—বলে' দেব, গুপী। তুই ওকে ওর সাজা নিতে দিচ্ছিস না—

গুপীর মাথাটা আর নীচু করা হইল না। কথাটা কর্তাদের কানে উঠিলে তাহার কী যে দুর্গতি হইবে তাহা কতকটা সে আন্দাজ করিতে পারে। কাহারও প্রতি দয়া দেখানর মত পাপ ইহাদের কাছে কিছু নাই। একবার চৌমুনির মেলায় ডাকাতি করিতে গুপী ইহাদের সঙ্গে গিয়াছিল। মেলা তখন সেদিনের মত চুকিয়া গিয়াছে। একটা দোকানীর ঘরে ঢুকিয়া বাক্স ছিনাইয়া আনিবার সময় দোকানী দুই সবল হাতে হরলালের কোমরটা চাপিয়া ধরিয়াছিল—কাছে ছিল গুপী। দোকানের মাচার উপর দোকানীর ছোট রুগ্ন একটা ছেলে কাঁথা মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিল—প্রচণ্ড গোলমালে ঘুম ভাঙিয়া যাইতে সে তখন করুণ স্বরে 'মা মা' বলিয়া কাঁদিতেছে। মা তাহার

আগেই মরিয়া গিয়াছিল—মা-হারা রুগ্ন ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়াই দোকানী হাটে আসিয়াছে। তাহাকে বাড়িতে সে কোথায়ই বা রাখিয়া আসিত! দোকানী হরলালকে এমন বে-কায়দায় ধরিয়া ফেলিয়াছিল যে, হাতের বর্শাটা সে কিছুতেই চালাইতে পারিতেছিল না। যতই সে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, দোকানী ততই প্রাণপণে চীৎকার করে, শিশুর তারস্বরেরও আর বিরাম নাই। গণেশরা অন্যত্র ব্যস্ত—হাতের কাছে গুপীই একমাত্র সম্বল। তখন সে ইহার চেয়ে আরো ছোট—এই সে দ্বিতীয়বার ডাকাতি করিতে আসিয়াছে। হরলাল বেগতিক দেখিয়া গুপীকে উদ্দেশ্য করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—শীগ্‌গির ঐ ছেলেটার গলাটা টিপে ধর, গুপী। ছারপোকার মত টিপে মেরে ফ্যাল্‌ শীগ্‌গির।

হরলালের আশা ছিল, দুর্বল ছেলেটাকে গুপীর নির্মম দুই হাতের তলায় মরিতে উদ্যত দেখিলে বাপের আক্রমণের ভঙ্গিটা কিছু শিথিল হইবে এবং এই ফাঁকে সে একটু আলগা পাইলেই অতি সহজেই বর্শাটার চমৎকার প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু গুপী কিছুতেই সেই ছেলেটার বিছানার দিকে পা বাড়াইতে পারিল না।

রুদ্ধকণ্ঠে হরলাল আবার চেঁচাইয়া উঠিল—ঐ ইটটা তুলে ছেলেটার মাথাটাতে বার কতক ঘা মার শীগ্‌গির। নইলে আমার সঙ্গে-সঙ্গে তোরও মুণ্ডুটা খসে' পড়বে, গুপী।

গুপী তবুও দ্বিধা করিতে লাগিল। ঝড়ো পাখীর মত অসহায় একটা ছেলে রোগশয্যায় পড়িয়া মা'র জন্য কাৎরাইতেছে, ঐ ভারি ইটটা তুলিয়া তাহার মাথায় সে কি করিয়া মারিবে?

হরলাল অনুনয় করিতে লাগিল—পায়ে পড়ি, গুপী। সেই সোনার হাত-ঘড়িটা তোকে আমি দিয়ে দেব। উঃ, কামড়ে আমার ঘাড়ের মাংস ছিঁড়ে নিল—শীগ্‌গির মার ইটটা, বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে' থেঁৎলে দে ব্যাটাকে—

যন্ত্রচালিতের মত গুপী ইটটা তুলিয়া লইল। চোখের পলক পড়িতে না পড়িতেই তুমুল কাণ্ড হইয়া গেল। সে-কথা মনে করিতে এখন গুপীর মাথার চুল আতঙ্কে খাড়া হইয়া উঠে। পৃথিবীতে যা' কিছু বলিতে দোকানীর ঐ একটি মাত্র সন্তান—মৃত্যু চোরের মত নিঃশব্দে নিতে না আসিয়া এমনি ভয়ঙ্কর উন্মত্ত দস্যুর বেশে কি না তাহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া যাইবে—

কথাটা একবার আয়ত্ত করিতেই দোকানী ছেলেকে বাঁচাইবার জন্য বুঝি ভুল করিয়াই হোক গুপীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু গুপীর হাতের ইটটা হাত বাড়াইয়া কাড়িয়া নিবার আগেই হরলালের বর্শা আসিয়া তাহার পেটের মধ্যে সজোরে বিদ্ধ হইল। সে কী রক্তবন্যা! যেন তরল আগুনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। বর্শাটা দোকানীর পেটের মধ্যে ঢুকিয়া পিঠের কোণ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহা খুলিয়া আনিবার সময় হরলাল এক হেঁচকা টান মারিয়া পেটটাকে ফাঁড়িয়া ফেলিল। গলায় যত জোর ছিল মুমূর্ষু ছেলেটা চেঁচাইয়া উঠিল—বাবা রে! সেই বীভৎস দৃশ্যের সামনে গুপী চক্ষু বুজিয়া কাঁপিতেছে—হরলাল সহসা তাহাকে কাঁধের উপর তুলিয়া নিয়াই খোলা মাঠের মধ্যে দিয়া চোঁচা দৌড় মারিল। কোন দিকে একবার চাহিয়া দেখিল না।

খালি শূন্য মাঠ ভরিয়া সেই মুমূর্ষু ছেলেটির কাতর আর্তনাদ বাজিতেছে। সে-আর্তনাদ গুপীর বুকের মধ্যে বর্শার বিষাক্ত ফলার মতই বিঁধিয়া রহিল।

কিন্তু বাড়ি আসিয়া হরলালের হাতে গুপীর লাঞ্ছনার আর শেষ রহিল না। সে কেন তাহার কথার অবাধ্য হইয়াছে, বলা-মাত্রই কেন সে হাতের ধারাল নখ দিয়া ছেলেটার টুঁটিটা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয় নাই, ইট তুলিতে কেন সে দুই মিনিট দেরি করিল, দেরি করিল ত' ছুঁড়িলনা কেন, ছেলেটা রুগ্ন ও মর-মর বলিয়াই তাহার অন্যায় মায়া কবিতে হইবে নাকি—এই অপরাধে হরলাল গুপীকে সমস্ত রাত্রি একটা শিরীষ গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল। তার পরে চালাও বেত। তাহাতেও নিস্তার ছিল না পায়ে বিছুটি ঘসিয়া দিল, কাঠ-পিঁপড়ার দঙ্গল আনিয়া চুলের মধ্যে ছাড়িয়া দিল—চরিয়া খাইতে। সকালবেলা তাহাকে যখন নামান হইল তখন গুপী ফুলিয়া একটা ঢাক হইয়াছে—সেই টিমটিমে গুপীকে চিনিবে কাহার সাধ্য।

সেই শাস্তির কথা এখনও তার মনে আছে। না, পরের জন্য অকারণে মায়া দেখাইয়া লাভ নাই। গুপী মাধবের সঙ্গে বড় বড় পা ফেলিয়া আগাইয়া চলিল। থাকুক ও পিছে পড়িয়া। কামড়াক না সাপে, কি যায় আসে উহাদের! এই পড়িল বুঝি হোঁচট খাইয়া। মরুক মুখ থুবড়াইয়া ইটের পাঁজার উপর—উহাদের কি? উহারা ফিরিয়াও তাকাইবে না।

গাছের শিকড়ে হোঁচট খাইয়া পড়ি-পড়ি করিয়াও অনিল মাথার মোটটা কোন রকমে সামলাইল। উহারা অনেক দূরে আগাইয়া গিয়াছে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোথায় যে পথ, কিছুই তার ঠাহর হয় না। দূর হইতে মশালের আলোটা ক্ষীণ দেখা যায়, কিন্তু কোন পথে যে তাহাকে সঙ্কেত করিতেছে কে বলিবে! মাধব আর গুপী তাহার সঙ্গে রহিল না কেন?

ভাগ্যিস তাহারা সঙ্গে নাই। বিদ্যুতের মত একটা চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। স্যুটকেসটা মাটির উপর নামাইয়া রাখিয়া এই অন্ধকারে অন্য কোথাও সরিয়া পড়িলে কেমন হয়! কথাটা মনে করিতেই ভয়ে তাহার গায়ের স্নায়ু শিরা ঝিম-ঝিম করিতে লাগিল। কিন্তু কোথায় সে যাইবে—কোন দিকে পলাইবে? অজানা পথ ঘাটে, সূচীভেদ্য অন্ধকার, পিছনে নদী, এখনও ঝড় গুমরাইতেছে—পলাইয়াই বা তাহার আশ্রয় মিলিবে কোথায়? হউক্, তবু এমন সুযোগ সে ছাড়িবে না। কাছাকাছি লুকাইয়া থাকিয়া তাহার এই মনোভাব কেহ টের পাইল কি না দেখিবার জন্য অনিল চারিদিকে তাকাইতে লাগিল।

কিন্তু বুলু—বুলুর কি হইবে? অনিলের প্রতি প্রতিশোধ নিবার জন্য যদি তাহাকে উহারা কাটিয়া ফেলে।

ছোট বোনটিকে ফেলিয়া একলা সে কী করিয়া পলাইবে?

যা থাকে অদৃষ্টে—অনিল চেঁচাইয়া উঠিল—তোমরা দাঁড়াও। অন্ধকারে একা আমি চলব কী করে'?

গুপী দাঁড়াইয়া পড়িল।

মরিতে হয় দুই ভাইবোনে গলাগলি করিয়া একসঙ্গে মরিবে কিন্তু কেহ কাহাকে ফেলিয়া পলাইয়া বাঁচিবে না।

গুপী বলিল—স্যুটকেসটা এবার আমার মাথার ওপর তুলে দে। মাধোটা অনেক এগিয়ে গেছে, জানতে পারবে না। কিছু ভয় নেই তোর।

মাথা হইতে ভারটা নামিয়া যাইতেই অনিল অনেকটা চাঙ্গা হইল। হাত-পা খোলা পাইয়া বনের মধ্য দিয়া উর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়া যাইতে আবার তাহার সাধ হইল—মাথায় প্রকাণ্ড ঐ বোঝা লইয়া গুপী তাহার পিছনে ছুটিতেও পারিবে না, বোঝাগুলি নামাইয়া রাখিতে-রাখিতে সে তখন কোন ঝোপের

আড়ালে স্বচ্ছন্দে গা ঢাকা দিতে পারিবে—কিন্তু ছোট বোনটির দুর্দশার কথা মনে করিতেই গা তাহার আবার অবশ হইয়া আসিল।

অনিল ভাবিয়াছিল ডাকাতরা না জানি কত বড়লোক, কিন্তু আসিয়া দেখিল উঠানের দুই পাশে দুইখানি মাত্র খড়ের ঘর—কোণে একটা আটচালায় কতকগুলি গরু বাঁধা। উহারা দিনেরবেলায় ক্ষেত চষে, সন্ধ্যা হইলে নৌকা লইয়া বাহির হয়—যাত্রী পারাপার করিবার অছিলায় তাহাদের পরপারে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করে।

বাহিরে এমনি নিরীহ হইয়া থাকিয়া তাহারা সবার চোখে ধূলা দেয়।

বাড়ি আসিয়া দেখে বুলু ফ্রক বদলাইয়া সদ্য-পাতা বিছানার এক ধারে বসিয়া আছে। গণেশ তাহার সামনে এক থালা খাবার লইয়া মিনতি করিয়া তাহাকে খাইতে সাধিতেছে—আর দাদা না আসিলে কখনই এইসব মুখে তুলিবে না বলিয়া সেই যে বুলু ঘাড় বাঁকাইয়াছে তাহা সোজা করে কাহার সাধ্য!

গণেশ বলিল—এই ত' তোমার দাদা এসেছে। নাও, খাও এবার।

দাদাকে সুস্থ দেহে ফিরিতে দেখিয়া খুসিতে বুলুর চোখ ছাপাইয়া উঠিল। কহিল—আমার মত দাদারও তেমনি হাত-মুখ ধুইয়ে কাপড় ছাড়িয়ে দাও—তবে আমরা খাব।

এইসব আখ্‌খুটেপনা হরলালের সহিতেছিল না। বুলুর একগোছা চুলে সে এক হেঁচকা টান মারিয়া কহিল—খাবি, না কি? এখুনি খেতে হবে সব। নইলে এ—ক চড়ে দাঁত বত্রিশটা গুঁড়ো করে' ফেলব।

গণেশ ক্ষেপিয়া উঠিল—খবরদার, ওর গায়ে হাত তুলতে পাবি না বলছি।

হরলালকে এই কথা বলিয়া নিরস্ত করিতে গিয়া গণেশের লজ্জার শেষ রহিল না। কোথাকার কে-একটা মেয়ের জন্য সে কি না দলের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে!

হরলাল রুখিয়া উঠিল—চড় কি, দা দিয়ে ছুঁড়িকে টুকরো-টুকরো করে' ফেলব না আমি—

গণেশ আর কোন কথা না বলিয়া অনিলের হাত-পা ধুইবার জোগাড় করিতে বাহির হইয়া গেল। মেলাই ঝঞ্ঝাটে পড়া গেছে যা হোক্।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া দুই ভাই-বোন শুইয়াছে। কিন্তু কাহারও চোখে ঘুম আসিতেছে না, দরজাটা পিছন হইতে তালা লাগান। বাঁশের শিক দিয়া পশ্চিম দিকে জানালা একটা খোলা আছে বটে।

বাহিরে উঠানে লুট-করা রাজ্যের জিনিসপত্র টাল করিয়া ফেলিয়া ডাকাতদের মধ্যে ভাগ-বখরা চলিতেছিল। ঘরের ভিতরে উহাদের কথা কহিবার পর্যন্ত জো নাই—একটি শব্দ হইলেই হরলাল তাড়িয়া আসে—কথা কইবি ত' ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব বলছি।

কাহার কী অংশ, কোথায় কী বিক্রী করিতে হইবে—সব ঠিক হইয়া গেল। এখন ঐ দুইটা ছেলে-মেয়ে নিয়া কী করা যায় তাহারই পরামর্শ।

সনাতন বলিল—গুপীর মত ছেলেটাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দলে ভর্তি করে' নিলে কেমন হয়?

গণেশ বলিল—শত হলেও ভদ্দর লোকের ছেলে ত', চট্ করে' ডাকাত সাজতে পারবে না, অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হ'বে।

হরলালও সায় দিল—ততদিন ওটাকে পুষবে কে? আর এদিকে পেছনে পুলিশ লেগে সব ভেস্তে দিক আর কি! ছোঁড়ার আত্মীয় স্বজনরাও য়্যাদ্দিন আর নাকে তেল দিয়ে ঘুম মারবে না। একটা পথ তারা দেখবেই।

গণেশ বলিল—হঁ্যা, ঠিক বলেছিস, ওতে বিপদ আছে। সোজাসুজি কিছু-একটা বিহিত করে' ফেলতে হ'বে। ওকে দলে ভিড়িয়ে নিলেও বা কী এমন সুবিধেটা হ'বে শুনি—লোকের অভাবে কোন্ কাজটাই বা আমাদের পড়ে' আছে। নিশ্চিন্তে এই যে এত বড় একটা ডাকাতি করে' এলাম—ক'টা লোক লাগল? হরলাল ত' সারাক্ষণ খালি তামাকই টান্‌লে।

সনাতন বলিল—তবে অন্য কিছু উপায় ত' ঠিক করতে হ'বে। ধরে' যখন আনাই হ'ল, তখন মিছিমিছি ত' আর ছেড়ে দেওয়া চলে না। কাজে একটা লাগাতেই হ'বে—

মুখের কথা লুফিয়া নিয়া হরলাল কহিল—যে কাজে পয়সা আসে।

উঠানের কথা-বার্তা ঘরের ভিতর থেকে দুই ভাই-বোন স্পষ্ট শুনিতেছে।

অচেনা বিছানায় শুইয়া কাহারও চোখে ঘুম আসিতেছে না—অথচ কড়া হুকুম, টুঁ শব্দটি করা যাইবে না। ভয়ে ঘনতর হইয়া দুই ভাই-বোন পাশাপাশি শুইয়া আছে, আর পরস্পরের নিশ্বাস শুনিতেছে। অনিলের হাতের মুঠার মধ্যে বুলুর একখানি হাত—সে-হাতখানি পায়রার পাখার মত নরম, দুর্বলতায় ও ভয়ে সে হাত ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে চরম কী ব্যবস্থা হয় শুনিবার ভয়ে বুলু দাদার বুকের কাছে শামুকের মত গুটাইয়া আসিল।

অনিল পশ্চিম দিকের খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল—ধূ-ধূ মাঠের উপর অন্ধকার আকাশ—কোথায় তাহার শুরু, কোথায়ই বা তাহার শেষ—চক্ষু মেলিয়া অনিল তাহার কিছুই কূল-কিনারা করিতে পারিল না। বুলুর চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে সে ভাবিতে লাগিল—ছোট বোনটিকে যদি বাঁচাইতেই না পারে, তবে সে দাদা হইয়াছিল কেন?

ডাকাতের পরামর্শ চলিয়াছে।

গণেশ কহিল—হ্যাঁ, নগ্‌দা কিছু লাভ না হ'লে চলবে কেন? আমি বলি কি, ওটাকে আসামের চা-বাগানে চালিয়ে দিয়ে আসি। হাতে-হাতে রোজগার। শিলচরে কুলির সর্দার তানকুর সঙ্গে ত' আমার সেই কথা। সেই ভেবেই ত' ছোঁড়াটাকে জলে পড়ে' মরতে দিলাম না।

সনাতন লাফাইয়া উঠিল। কহিল—তুই ত' সেখানে কতবার গেছিসও। দিয়ে আয় ওটাকে তানকুর হাতে—পাবি কত, শুনি?

গণেশ বলিল—যা পাওয়া যায়; মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে তাই লাভ।

সনাতন খুসি হইয়া বলিল—এদিকে ছুঁড়িটাকে আমরা কালীর মন্দিরে বলি দিই।

ঘরের মধ্যে বুলু দাদাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল।

কথা কওয়া বারণ, তবু বুলুর কানের কাছে মুখ আনিয়া মুমূর্ষুর মত ক্ষীণ কণ্ঠে অনিল কহিল—তোর কিছু ভয় নেই, আমি আছি কি করতে! আমি তোর দাদা না? আমিই তোকে বাঁচাব।

তবু, বুলু কি করিয়া আশ্বস্ত হয়? বুলুকে না-হয় দাদা বাঁচাইল, কিন্তু দাদাকে কে বাঁচায়?

দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া বুলু ফুঁপাইয়া উঠিল।

অনিল বুলুর কানের কাছে আবার মুখ আনিয়া অসহায় অস্ফুটস্বরে কহিল—বাঁচাতে যদি না-ই পারি, তবে একসঙ্গেই আমরা মরব। একলা একজন বাড়ি ফিরে গেলে মা যখন আর একজনের কথা জিগ্‌গেস করবেন, তখন—

কথা আর শেষ হইল না, অনিলও কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু কাঁদিলে পাছে বুলু আরও অস্থির হইয়া পড়ে সেই ভয়ে কান্না দমন করিয়া সে কহিল—দু'জনে গলাগলি করে' মরলে আর কষ্ট কী! একজনকে চোখের সামনে মরতে দেখলেই ত' কষ্ট। মরার পর আমরা ঐ দুটি পাশাপাশি তারা হয়ে আকাশে জেগে থাকব। চেয়ে ত্যাখ বুলু।

বুলু তার ছল্‌ছলে দুইটি চোখ তুলিয়া জানালার বাহিরে প্রকাণ্ড আকাশের পানে তাকাইল। ম্লান কণ্ঠে কহিল—কিন্তু ঐ তারা দুটো যে আমরা, তা মা কি করে' চিনতে পারবেন? হাতছানি দিয়ে ডাকলে ত' ওরা আকাশ থেকে নেমে আসবে না। ওরা অনেক দূরে দাদা, অত দূরে গিয়ে মাকে ছেড়ে থাকব কি করে?

বুলু আবার কাঁদিতে লাগিল।

অনিল বলিল—চুপ কর বুলু। ওরা শুনতে পাবে। ততক্ষণ মনে-মনে মা-কালীকে ডাকি আয়—মনে-মনে ডাকলেও ত' তিনি শুনতে পান।

বুলু রাগ করিয়া কহিল—ঐ পেত্নীকে আমি কিছুতেই ডাকতে পারব না। যে-রাক্ষুসি ছোট-ছোট ছেলেপিলের রক্ত খেতে চায়, তাকে ডাকতে তোর লজ্জা করে না, দাদা?

অনিল তবু বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া অবুঝ বোনটির চুলে হাত বুলাইতে থাকে। প্রাণপণে চক্ষু বুজিয়া সে কালীকে ডাকিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কি বলিয়া যে ডাকিবে কিছুই বুঝিতে পারে না। কেবল মনে হয় বিপুল অন্ধকারের সমুদ্র তাহাদের গ্রাস করিবার জন্য দিকে দিকে রাশি-রাশি ঢেউ তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে।

সনাতনের প্রস্তাব শুনিয়া ডাকাতরা অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিল না। এ-যাবৎ কালী-মন্দিরে কোন কিশোরীকে বলি দেওয়া হয় নাই। বলিটা অবশ্য বাৎসরিক নিত্যকর্ম ছিল—বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে একটা কচি নরমুণ্ড না

পাইলে সিদ্ধিদায়িনী কালী রুষ্ট হইয়া প্রসাদ দানে কুণ্ঠিত থাকিবেন—ডাকাতদের মনে এমনি একটা প্রবল বিশ্বাস ছিল। তাই অমাবস্যার আগের রাত্রে যেখান থেকে হউক্ তারা একটি শিশু মা'র কোল হইতে ছিনাইয়া আনিত—কিন্তু তাই বলিয়া অমন সুন্দর একটি মেয়ে—সিল্ক-এর মত পাৎলা চক্‌চকে যার চুল, মুখের কথাগুলি যার মধুতে মাখা, সদ্য-ফোঁটা যুঁই ফুলটির উপর ভোরবেলার শিশির জমিয়া আছে এমন যার চোখের জলে ভেজা সুন্দর মুখখানি—তাহাকে খাঁড়া দিয়া মা-কালীর কাছে বধ করিতে হইবে এই কথাটা শুনিয়া প্রথমটা সবাই আতঙ্কে কেমন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মুখে কাহারও কথা সরিতেছে না।

সনাতন কথা কহিল। গোঁফের প্রান্তটা চুম্‌রাইয়া সে কহিল—কথাটা শুনে তোরা এত ঘাবড়ে গেলি কেন, বল দিকি। মা এবার মেয়ের মুণ্ডু চান—আমাকে কাল রাতে স্পষ্ট স্বপ্ন দেখিয়েছেন। মেয়ের রক্ত নাকি বেশি নির্মল—মা এবারে একটু মুখ ফেরাবেন, বল্লেন। শেষকালে কোথায় মেয়ের খোঁজে নদী চষে' ফিরব—হাতে যখন একটা এসে পড়েছে, তখন এটাকে জিইয়ে রাখতে হ'বে।

মাধব মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিল—কে জানে, এ-ই হয় ত' মা-কালী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হরলাল কহিল—তাই হ'বে।

কিন্তু গণেশের বুক কাঁপিয়া, হাতে-পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরিয়া, চোখে-মুখে অন্ধকার করিয়া সহসা কেমন যেন করিয়া উঠিল কে বুঝিবে। সে কথাটা শুনিয়া গোড়া হইতেই একেবারে পাথর হইয়া গিয়াছে, প্রস্তাবটা এখন প্রায় সাব্যস্ত হয় দেখিয়া সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—তোরা বলিস কি, সনাতন? ঐ মেয়ের ঘাড়ে তোরা খাঁড়া বসাবি?

সনাতন জোর গলায় কহিল—হ্যাঁ, দোষটা কোথায়?

—না, খবরদার, ও-কথা তোরা মুখেও আনতে পারবি না।

সনাতনও উঠিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল—তবে এই মেয়ে নিয়ে তুই করবি কি?

গণেশ কহিল—বুলুকে আমি নিজের কাছে রেখে দেব। তারপর তন্ময়

হইয়া আপন মনে কহিতে লাগিল—ওকে আমি বড় করব, রাজার ঘরে বিয়ে দেব, হাতীর হাওদায় চড়ে' বাজনা বাজিয়ে রাজপুত্র আসবে—আমার ধন দৌলত সব কিছু দিয়ে ওর জন্যে প্রকাণ্ড এক দীঘি কাটিয়ে মাঝখানে শ্বেতপাথরের বাড়ি বানিয়ে দেব। দীঘির জলে ময়ূরপঙ্খী নৌকো চালিয়ে ও রাজপুত্রের সঙ্গে হাওয়া খাবে।

কথা শুনিয়া সবাই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে-হাসি এমনি প্রচণ্ড যে, ঘরের ভিতর বুলুর মনে হইল যেন কাহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া হাজার-হাজার শেয়াল মহোল্লাসে কাড়াকাড়ি লাগাইয়াছে। সে দাদাকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—কী হ'বে, দাদা?

অনিল চাপা স্বরে কহিল—কিছু ভয় নেই, বুলু। ওরা তোর বিয়ে দেবে।

বিয়েটা যে এমন ভয়ঙ্কর একটা জিনিস, বুলু এই প্রথম শুনিল।

বাহিরে হাসি আর থামিতে চায় না। হরলাল মাটিতে প্রায় গড়াইয়া কহিল—তুই পাগল হলি নাকি, গণ্শা? দীঘি কাটিয়ে বাড়ি করে' দিবি? মানুষ করে' বিয়ে দিবি ওকে? তবে ওর বাপ বেচারাই বা দোষ করল কী! বাবা, এত ঠাট্টাও জানিস তুই—পেটের নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে গেল!

সত্যই, গণেশ ঠাট্টা করিতেছিল নাকি! এমন কথা গাঁজায় দম না দিয়া সে বলিল কি করিয়া? তাহার কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল দেখিয়া এখন তাহার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল। ইহার চেয়ে সে চিমটা ও কমণ্ডলু লইয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া গেলেই ত' পারে।

গণেশ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিল—কিন্তু মা'র মন্দিরে ওকে বলি আমি কিছুতেই দিতে পারব না।

সনাতন কহিল—বললেই ত' হ'ল না—মা'র আদেশ যে!

—হোক্ মা'র আদেশ! আমার ঘাড়ের ওপরই বরং খাঁড়া বসাস, কিন্তু বুলুকে আমি কাউকে ছুঁতে দেব না।

সনাতন কহিল—বলি যদি না-ই হয়, মেয়েটা ফৈজুর কাছে বেচে দিলেই ত' ল্যাঠা চুকে যায়। মেয়ে আর একটা কেড়ে আনতে কতক্ষণ! মাধো আর গোপীই তা' পারবে—কি রে, পারবি নে?

মাধব প্যাট-প্যাট করিয়া চাহিয়া বলিল—ক'টা চাই?

তার কাঁধ চাপড়াইয়া সনাতন বলিল—এই ত' মরদের মত কথা !

গণেশ বুলুদের ঘরের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। ফৈজুর কাছে বেচিয়া দিতে সে আর আপত্তি করিবে না! কোথাকার কে মেয়ে—তাহার জন্য কিসের মায়া! তাহার জন্য সে কিনা দলের লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধাইবার উপক্রম করিয়াছে! ভাবিতে নিজেরই তাহার লজ্জা করে।

তবু মেয়েটি এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িল কিনা জানিবার জন্য গণেশ আর কথা না কহিয়া উহাদের ঘরের দিকে আগাইতে লাগিল। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া গণেশ কহিল—ঘুমিয়েছ, খুকি ?

অন্ধকারে জানালার বাহিরে বীভৎস মুখটা প্রথমে বুলুরই চোখে পড়িল। সে ভয় পাইয়া দাদাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কহিল—এই দাদা, কে এল ছাখ —ঐ জানলার ধারে—

গণেশ মোলায়েম গলায় কহিল—আমি, আমি গণেশ—ভয় নেই তোমার, ঘুম আসছে না, বুলু ?

বুলু ধমক দিয়া উঠিল—খুব ঘুম আসছে। তুমি যাও এখান থেকে—নিজে গিয়ে ঘুমোও গে এবার।

কতক্ষণ পরে চোখ চাহিয়া গণেশকে আর জানালায় দেখা গেল না! ডাকাতদের গোলমাল তখন থামিয়া গিয়াছে। সমস্ত মাঠ ও আকাশ ভরিয়া অপরিসীম স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা ভাঙিয়া কথা কহিতে পর্যন্ত ভয় করে।

বুলুর কানের কাছে মুখ আনিয়া অনিল কহিল—এখান থেকে পালাবি ?

গাছের উপর-ডালের পাতার মত বুলুর শরীর কাঁপিয়া উঠিল। অনিলের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কহিল—পালাবি, দাদা ? কিন্তু কি করে' পালাবি ? ভীষণ অন্ধকার যে।

অনিল কহিল—অন্ধকারেই ত' সুবিধে, সহজে কেউ টের পাবে না।

আনন্দে বুলু বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। উচ্ছল কণ্ঠে কহিল—তবে এখুনি চল দাদা, আর দেরি নয়।

অনিল তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল—আস্তে! হয় ত' ওরা এখন উঠোনে পায়চারি করছে। এই মতলব একবার শুনতে পেলে ওরা আমাদের আর আস্ত রাখবে না।

বুলু নিস্তেজ হইয়া আসিল। ম্রিয়মানের মত বালিশে মাথা রাখিয়া সে কহিল—তবে কী করে' পালাবি? দরজাও ত' বন্ধ।

অনিল কহিল—পালাব জানলার মধ্যে দিয়ে। জানলাটা উঁচু—তাতে কি? আমি তোকে কাঁধে তুলে নিয়ে দাঁড়াব, তুই আস্তে-আস্তে মাথা গলিয়ে দিয়ে ওপারে লাফিয়ে পড়বি, পারবি নে?

বুলু জানালার দিকে চাহিয়া সামান্য একটু-কি হিসাব করিয়া কহিল—খুব পারব; কিন্তু তুই?

—আমার জন্যে ভাবিস নে—

বুলু মুখ ভার করিয়া কহিল—না, ভাববে না! আমাকে ওপারে একা নামিয়ে দিয়ে তুই যদি আর নামতে না পারিস? তখন কী হ'বে?

অনিল উদাসীনের মত কহিল—ও আর এমন উঁচু কি? বেড়া ধরেই ত' অনায়াসে উঠতে পারব। জায়গায় জায়গায় পা রাখবার জন্যে দস্তুরমত ফাঁক আছে। পাইপ বেয়ে একবার তেতলার ছাতে উঠেছিলাম বল কুড়োতে—তোর মনে নেই? ভুলে গেছিস্?

বুলুর উৎসাহ আর ধরে না, অনিলের গায়ে ঠেলা দিতে-দিতে কহিল—তবে উঠে পড়্ শীগ্গির—এখুনি পালাই। কিন্তু তারপর কোন্ দিকে যাবি, শুনি? এই অন্ধকার মাঠের মধ্যে পথ খুঁজে পাবি?

অনিল কহিল—একবার কোন রকমে বের হই ত'।

দুই হাতে কপালের উপর হইতে চুলগুলি মাথার দুই দিকে ঠেলিয়া দিয়া বুলু কহিল—আর তা' হ'লে দেরি নয়, দাদা—

বুলু তক্তপোষ হইতে নামিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া অনিল কহিল—আরও খানিকটা সময় যাক, ওদের ঘুমটা আরও একটু পাকুক। পালাবার আওয়াজ পেয়ে জেগে উঠলে আর আমাদের রক্ষে নেই!

বুলু শুইয়া পড়িল—দাদার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল—ধরা যদি পড়ি, তা' হ'লে কী হ'বে? দু'জনকে জ্যান্ত পুঁতেই ফেলবে হয় ত' ডাকাতগুলো।

অনিল শাসনের স্বরে কহিল—এখন চুপ করে' একটু ঘুমো দিকি।

—ঘুমোব কি দাদা? পালাবি নে?

আরও ঘণ্টা দুই বাদে। মেঘ ডাকছে—খুব জোরে বৃষ্টি আসবে দেখছি। বৃষ্টি এলেই মজা হয় এবার।

বুলু আশ্চর্য হইয়া কহিল—বৃষ্টি এলে পালাবি কি করে'?

—বৃষ্টিতেই ত' পালাবার সুবিধে। একে অন্ধকার রাত, তায় বৃষ্টি—ওরা আমাদের খুঁজেই পাবে না। আমরা মাঠ ধরে' হাঁটতে হাঁটতে কোথাও না কোথাও ট্রেন-লাইন পেয়ে যাব।

বুলুর সমস্ত শরীর নিমিষে প্রজাপতির পাখার মত হাল্‌কা হইয়া গেল। দাদার গলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সে কহিল—তবে আসুক বৃষ্টি—ঝড়ের সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও ছুটব মাঠ-বন ডিঙিয়ে—ট্রেন-লাইন ধরে' সোজা কলকাতা। ষ্টেশনে পেঁৗছেই নেব একটা ট্যাক্সি, কী মজা!

শাসনের সুরে অনিল কহিল—অত চ্যাঁচাস্‌নে, শুনতে পাবে। হয় ত' বেড়ায় ওরা কান পেতে আছে।

তাড়াতাড়ি জিভ কাটিয়া বুলু কহিল—না, এই আমি চুপ করলাম, দাদা। কিন্তু ট্রেনে উঠতে গেলে আমাদের টিকিট লাগবে না? আচ্ছা—এই, এইবার আমি ঠিক চোখ বুজেছি—দু'ঘণ্টা পর আমাকে জাগিয়ে দিস কিন্তু। কি মজা, আবার বৃষ্টি আসছে।

চোখ বুজিয়া বুলু মনে-মনে চলন্ত ট্রেনের ছবি আঁকিতে লাগিল। ঝুলান ঘণ্টার গায়ে কুলি বাড়ি দিতেছে—এক, দুই, তিন—ইঞ্জিনটা এই ফুঁ দিল—গাড়িতে টান পড়িয়াছে। তারপর, চোখের সামনে দিয়া অন্ধকার আকাশে অগণন তারার ফুলঝুরি! কোথাও এতটুকু মেঘ নাই—যেন মা শিয়রে বসিয়া গুন্‌গুন্‌ করিয়া গান করিতেছেন—সেই গানের এক-একটা শব্দ উপরে উঠিয়া তারা হইয়া যাইতেছে।

তারপর চারিদিক ঠাণ্ডা করিয়া অনর্গল ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

দুই ঘণ্টা কখন কাটিয়া গিয়াছে। বুলুর ঘুম আর কেহ ভাঙাইল না। আকাশের মেঘ দেখিতে-দেখিতে মা'র কথা মনে করিয়া অনিলও কখন অজানিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—তাহাকেই বা কে জাগাইয়া দিবে?

স্বপ্নে বুলু তখন বাড়ির চায়ের টেবিলের ধারে বেতের চেয়ার টানিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া টোষ্ট খাইতেছে—মা কত সব খাবারের আয়োজন করিয়াছেন,

সব সে দাদার দিকে ঠেলিয়া দিতেছে—খিদে মা, দাদারই বেশি পেয়েছে আমার চেয়ে, আমাকে পিঠে করে' কত নদী সাঁত্‌রে, কত পাহাড় টপ্‌কে, কত বন-বাদাড় পেরিয়ে ও এল—জান না মা, পথের সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা বাঘ এসে পড়ল—কি তার চোখ, কি-বা তার থাবা—

চিড়িয়াখানার খাঁচা ভাঙিয়া বাঘ একটা সত্য-সত্যই যেন চায়ের টেবিলের উপর লাফাইয়া পড়িয়া সব কাপ-প্লেট ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল।

বুলুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ চাহিয়া দেখিল, বিছানার সামনে গণেশ চোখ বড় করিয়া তাহার পানে চাহিয়া মুচকি-মুচকি হাসিতেছে।

দাদা?—বুলু ধড়মড় করিয়া উঠিল। না, দাদা তাহার পাশেই শুইয়া ঘুমাইতেছে।

দাদা কি তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া একা চলিয়া যাইতে পারে?

বুলু ও অনিলের চোখে সব কিছু কি-রকম অদ্ভুত লাগিতেছে। কলিকাতায় আকাশ কেমন সঙ্কীর্ণ, ধোঁয়ায় বিবর্ণ, ম্লান আর—আর এখানকার আকাশের সীমা দুই চোখে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পৃথিবীটা যে কত বড়—এমনি একটা অস্পষ্ট অনুভূতি দুইটি কিশোর ভাই-বোনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যে করিয়াই হউক, এই বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইয়া অন্য কোথাও—অন্য কোন পথের সন্ধানে যাত্রা করিতেই হইবে এমনি একটা চেতনা সমস্তক্ষণ তাহাদের নাড়া দিতে লাগিল।

সকালবেলায়ই ডাকাতেরা মাঝি সাজিয়া ভাড়া খাটিতে বাহির হইয়াছে। গণেশ প্রথমটা যাইবে না ভাবিয়াছিল, কিন্তু সামান্য একটা মেয়ের জন্য সে তার দৈনন্দিন কাজে অবহেলা করিবে ভাবিতে তাহাকে কে যেন চাবুক মারিল। গুপী ও মাধবকে বলিয়া গেল উহাদের উপর কড়া নজর রাখিতে আর বলিয়া গেল যেন বাড়ির উঠান হইতে উহারা এক পা না নড়ে।

উহারা চলিয়া গেলে অনিল গুপীকে জিজ্ঞাসা করিল—অমাবস্যার আর কত দেরি?

গুপী কহিল—পরশু রাত।

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বুলু বলিল—আমাকে সেদিন কালীর মন্দিরে বলি দেবে তোমরা ?

মাধব আগাইয়া আসিয়া কহিল—তাই ত' ঠিক হ'ল।

সজল চোখে বুলু কহিল—তোমাদের একটুও কষ্ট হ'বে না ? তোমাদের ছোট বোন নেই ?

গুপীর মনটা দুলিয়া উঠিল, আশ্বাস দিয়া কহিল—আমরা অন্য ব্যবস্থা করে' ফেলব—তার জন্যে তোমায় ভাবতে হ'বে না।

অনিল কহিল—সে ত' পরশুর কথা—তার দেরি আছে। আয় বুলু, এখন একটু বেড়াই। কেমন সুন্দর জায়গা! ওটা কী পাখী, ভাই ?

দাদার গলার স্বরে কেমন একটা নিশ্চিন্ত ভাব, বুলু তাহাতে সাহসের আভাস পাইয়া মনে-মনে খুসি হইয়া উঠিল। মাধব কহিল—কিন্তু উঠোনের থেকে পা বাড়াতে পারবে না—

অনিল কহিল—কোথায়ই বা আমরা যাব। পালাবার ত' আমাদের পথ নেই—পথ-ঘাট কে দেখিয়ে দেবে, বল ?

গুপী বলিল—একটু এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে আনলে ক্ষতি কী!

মাধব চক্ষু পাকাইয়া বলিল—সর্দারের কানে উঠলে তোর গায়ে আর চামড়া থাকবে না, গুপী!

বুলু কহিল—আমরা যদি পালিয়ে যাই তবেই না গুপীর দোষ হ'বে। একটু বেড়িয়ে ফিরে এলেই ত' হ'ল! কলকাতার খাঁচায় থাকি আমরা, এমন মাঠ আর হাওয়া কোনদিন দেখিও নি।

মাধব আবার শাসাইল—এ কিন্তু ভাল হচ্ছে না, গুপী!

বুলু গুপীর হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে কহিল—তুমি ওর কথায় ভয় পেয়ো না। আমরা ত' ফিরেই আসছি। সর্দার তোমাকে কিচ্ছু বলবে না। আমিই বরং ওর নামে পঁচিশ কথা লাগিয়ে দেব, দেখ।

গুপীর সঙ্গে-সঙ্গে দুই ভাই-বোন উঠান ছাড়িয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। গাছে-গাছে অসংখ্য পাখী, লতায়-লতায় অসংখ্য ফুল—শব্দে গন্ধে সমস্ত বন স্পন্দিত হইতেছে—দিনেও অন্ধকার এই বনে চারিদিক হইতে তরঙ্গ তুলিয়াছে —নদীর ঘাট হইতে এই বনের পথ ধরিয়াই তাহারা আসিয়াছিল বলিয়া

তাহারই সন্ধান নিতে অনিল গুপীকে এখানে টানিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু গুপী বেশি দূর আগাইতে চায় না, বলিল—চল, ঐ ফাঁকা মাঠে বেড়িয়ে আসি।

পশ্চিমে) বন শূন্য মাঠে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে—তাহার উপর আসিয়া অনিলের মন ধাবমান পাখীর প্রসারিত ডানার মত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ গুপী, ধারে-পারে এখান দিয়ে কোথাও ট্রেন চলে না?

—ট্রেন? গুপী বলিল—চারদিকে এর নদী, কোথা দিয়েও বেরুবার উপায় নেই—

অনিল গুপীর মুখের দিকে তাকাইল, হয় ত' তাহার মনের কথা ইহার কাছে ধরা পড়িয়া গেছে, তাই সে ব্যস্ত হইয়া কহিল—না না, এ-জায়গা মন্দ কি এমন! কাছে নদী থাকলে ত' লোকের স্বাস্থ্য ভাল হয় শুনেছি।

কিন্তু নদীর নাম শুনিয়া, গর্জমান তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদীর কল্পনা করিয়া অনিলের মন মুষড়িয়া পড়িল। দুই চোখ প্রসারিত করিয়া ধরিয়াও কোথাও তীরের সামান্যতম সঙ্কেত খুঁজিয়া পাইল না। তবু সে সাহস করিয়া প্রশ্ন করিল—এর চারদিকেই নদী—তা' কেমন করে' হ'তে পারে! এ ত' আর দ্বীপ নয়!

গুপী বলিল—উত্তরের মাঠ দিয়ে নাক-বরাবর মাইল পাঁচ-ছয় হাঁটলে একটি ভদ্দরলোকের গাঁ পাওয়া যায় বটে। ঐ যে তাল গাছ দেখছ—ঐ যে—

অনিল আর বুলু সতৃষ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেই উত্তরের মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। দূরে কয়েকটি বড়-বড় তাল গাছ দেখা যায় বটে—তাহার পিছন হইতে আকাশ উঁকি দিয়া যেন হাতছানি দিয়া উহাদের ডাকিতেছে!

এক জায়গা হইতে রওনা হইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আবার সেই জায়গাটিতেই পৌছান যায়—মাইল পাঁচ-ছয় আর এমন কী পথ! কিন্তু বুলু কি এতদূর হাঁটিতে পারিবে?

মাঠের মধ্যে এ-পাশে ও-পাশে দুই-একটি লোক দেখা যাইতে লাগিল। গুপী ব্যস্ত হইয়া কহিল—আর যায় না খোকাবাবু, এবার ফের'।

একজন লোক একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ভয়ে গুপীর মুখ

ডাকাতের হাতে

শুকাইয়া গেল—পুলিশের লোক হয় ত' ছদ্মবেশে আসিয়া পড়িয়াছে! পলাইবারও পথ পাইবে না। কিন্তু না, লোকটি অন্যদিকে চলিয়া গেল। অনিল তাহাকে ডাকিতে গিয়া ডাকিতে পারিল না।

গুপী ধমক দিয়া উঠিল—শীগ্‌গির ফের' বলছি—পা চালিয়ে।

যাক্, বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। বুলু বলিল—তোমার ঐ তালগাছের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না ভাই? এখানে কী করতে আছ? বাড়িতে তোমার মা নেই?

গুপী বুলুর স্নেহ-কোমল মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল—কেউ নেই। তাই এখানে পড়ে' আছি।

উঠানে নামিয়াই গণেশ হাঁক দিল—বুলু!

ডাক শুনিয়াই বুলু তাহার ঘাড়ের উপর ছোট-ছোট চুলগুলি দুলাইতে-দুলাইতে ছুটিয়া আসিল, গণেশকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—দেখবে এস, আমরা ক্যারম খেলছি। ঘুঁটিগুলো একটাও হারায়নি—তুমি খেলবে আমাদের সঙ্গে? এস না, বেশ ত'; তোমার ফাইন লাগবে না।

গণেশ বুলুর চুলগুলি কপালের উপর হইতে কানের পিঠের কাছে তুলিয়া দিতে-দিতে কহিল—তোমার জন্যে কত কচি আম পেড়ে এনেছি, ফুটি, তরমুজ, —ইলিশমাছ ভাজা খাবে না?

বুলু আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। কহিল—তোমাদের এখানে গোলাপজামের গাছ নেই? কলকাতায় এক কুড়ির দাম দু আনা! খাওনি কোনদিন?

—আছে বৈকি। সে ঠিক নদীর পাড়ে। আগে বলনি কেন?

—আমাকে নিয়ে যাও না সেখানে। আমি ঠিক গাছে উঠতে পারব। আমি ত' কেমন হাল্কা, একেবারে উঁচু ডালে চড়ব, দেখ। তুমি ত' পড়ে'ই যাবে উঠলে পরে।

বুলুর নিঃসন্দেহ ও নির্ভয় মুখখানির দিকে চাহিয়া থাকিতে-থাকিতে গণেশ কহিল—বিকেলে তোমাকে ঠিক এনে দেব—এক ঝুড়ি। কত তুমি খেতে পার দেখব'খন!

—এখুনিই নিয়ে যাও না। বেশ ত' গুপীকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও—পথ দেখিয়ে দেবে। দাদাও কিন্তু গোলাপ-জাম খেতে ভালবাসে—ও-ও খাবে। গুপীকে তুমি একবার বল না। আমরা ত' আর পালিয়ে যাচ্ছি না?

—আমাকে ছেড়ে কোথায় পালাবে? বলিয়া গণেশ দুই ব্যাকুল হাতে বুলুকে কোলে তুলিয়া লইল। খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর মত অসহায় করুণ চোখে বুলু চারিদিকে চাহিতে লাগিল—চারিদিক এত বড় ফাঁকা, অথচ পাখা মেলিবার তাহার এতটুকু জায়গা নাই!

গণেশ বুলুকে কোলে তুলিয়া আদর করিতেছে দেখিয়া হরলাল আর সনাতন দুইজনে খুব হাসাহাসি করিতে লাগিল। হরলাল বলিল—আর বেশি সময় নেই, গণেশ। মোটে পরশু রাত। মনে থাকে যেন।

সেই কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া গণেশ বুলুকে পরিপাটি করিয়া ফল খাওয়াইতে বসিল। কিন্তু মেয়েটি এমন নাছোড়াবান্দা যে দাদাকে না হইলে কোন কিছুতেই তাহার হাত উঠিবে না। অগত্যা অনিলকেও ডাকিতে হইল। অনিলের জন্য গণেশের এতটুকু মায়া নাই—তাহার কেবলই মনে হয় ঐ ছেলেটা অত্যাচারীর মত বুলুর স্নেহে আসিয়া ভাগ বসাইতেছে।

সমস্ত দিনে দুই ভাই-বোন কোথাও এতটুকু ছাড়া পাইল না। বদ্ধ ঘরের মধ্যে বসিয়া খোলা জানালা দিয়া চারিটি সতৃষ্ণ চক্ষু বহু দূরে পাঠাইয়া দিল—সেই চক্ষু বন নদী পার হইয়া তাহাদের কলিকাতার বাসায় গিয়া বসিয়াছে। ছুটির দিনে সেই তাহাদের দোতলায় শ্বেতপাথরের ঠাণ্ডা বারান্দাটি, গলিতে, কাঠি-বরফওয়ালা ফিরি করিয়া চলিয়াছে; স্কুলের টাস্ক ফেলিয়া তাহারা দুইজনে সিঁড়ি দিয়া তরতর করিয়া নামিয়া গেল। অনিলের বরফটা লাল, বুলুরটা সবুজ। সব তাহাদের চোখে ভাসিতেছে। বেলা পড়িয়া আসিলে মা নীচে নামিয়া ষ্টোভ ধরাইলেন—চায়ের সঙ্গে, পাঁপর-ভাজা খাইতে-খাইতে তাহারা দুইজনে বায়স্কোপে যাইবার কথা তুলিল—স্নাব্ পোলার্ডের গোঁফ দেখিয়া তাহারা সেদিন কী হাসিয়াছিল, এত ধস্তাধস্তি করিয়াও হ্যারল্ড্ লয়েডএর চশমা ভাঙে না, চার্লির আদৎ ফোটাইতে কিন্তু এক ফোঁটা গোঁফ নাই! —কত সব কথা! মা তবু আপত্তি করিতেছিলেন। এমন সময় কোর্ট হইতে বাবা ফিরিলেন, পকেটে হাত রাখিয়া বলিলেন—

আজ কত পেয়েছি বল দেখি? অনিল আর বুলু লাফাইয়া উঠিল। অনিল বলিল—দশ। বুলু বলিল—পঁচিশ। বাবা হাসিমুখে বলিলেন—কেউ পারলিনে—ছাব্বিশ টাকা। বুলু বাবার পকেট ধরিয়া মাতামাতি শুরু করিল: ঠিক হয়েছে—আমি বলেছি, বাবা। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন—কী করে' ঠিক হ'ল? তুই ত' বললি পঁচিশ? বুলু বলিল—বা, ও-টাকাটা দিয়ে যে আমি আর দাদা বায়স্কোপ দেখব। তা হ'লে পঁচিশ হ'ল না? এই করিয়া তাহাদের বায়স্কোপ যাওয়া মঞ্জুর হইয়া গেল। স্পষ্ট ছবির মত তাহাদের চোখে ভাসিতেছে যেন সমস্ত কিছু।

কিন্তু এই দিগন্তবিস্তীর্ণ স্তব্ধতার কত দূরে সেই চলমান, মুখর, কোলাহল-চঞ্চল কলিকাতা কে তাহার হিসাব করিবে।

রাত্রিতে শুইবার সময় বুলু গণেশকে কহিল—তুমিও আমাদের ঘরে শোও এসে, সর্দার।

গণেশ হাসিয়া বলিল—কেন, ভয় করে বুঝি? কিসের ভয়?

বুলু কহিল—না, জোয়ান কেউ ঘরে না থাকলে যদি তোমাদের সেই ফৈজু মিঞা আমাকে চুরি করে' নেয়। দাদা ত' ভীষণ ভীতু। বলিয়া সে অনিলের পানে চাহিয়া হাসিল। অনিল মুখ গম্ভীর করিয়া রহিল। তাহার শিখান কথা বুলু ঠিকমত বলিতে পারিতেছে না।

গণেশ বলিল—আমি থাকতে কার সাধ্য তোমাকে চুরি করে' নেয়?

—সেই জন্যেই ত' তোমাকে শুতে বলছি। দূরে থাকলে ত' আমার কান্নাও শুনতে পাবে না, তা' ছাড়া মুখে কাপড় গুঁজে দিলেই ত' পরিষ্কার!

অগত্যা গণেশকে তাহাদের ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতিয়া শুইতে হইল। ঘরে গণেশ নিজে শুইল বলিয়া দরজায় আর তালা লাগান হইল না।

গণেশের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া বুলু ও অনিল ঘুমাইবার ভান করিয়া চুপ করিয়া গেল। গণেশের নাক রীতিমত গর্জন শুরু করিয়াছে। ভয় তাহাদের বরং বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু দরজাটা যে বাহির হইতে বন্ধ করা হয় নাই তাহাতেই তাহাদের বুকের ভার নামিয়া গিয়াছিল। বুলু কখনই জানালা টপকাইতে পারিত না। পা পিছলাইয়া একবার খোঁড়া হইলেই সব সাফ্ হইয়া যাইত।

দুই ভাই-বোন নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মুহূর্ত গুণিতে লাগিল। অনিল বুলুকে বুকের একান্ত কাছে টানিয়া খুব আস্তে-আস্তে কহিল—তুই আগে উঠে দরজা খুলে বেরো। যদি শব্দ শুনে ও জেগে ওঠে, হাসি-মুখে বলবি ঘরে ভীষণ গরম, ঘুম আসছোনা; চল, বাইরে একটু বেড়াই। গরমের রাতে কল্‌কাতার ছাতেই আমাদের শোয়া অভ্যাস্—বুঝলি ?

বুলু বুঝিয়াছে। সে উঠিল। অনিল আবার ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল—হ্যাঁ, হাঁটু দিয়ে দরজার একটা পাল্লা চেপে ধরলেই খিলটা শব্দ না করে' উঠে আসবে। দিনেরবেলায় আমি পরীক্ষা করে' দেখেছি। দরজাটা খোলা রাখবি, আমিও খানিক বাদে বেরিয়ে পড়ব, দূরে ঐ শিরিষ গাছটার তলায় দাঁড়াস্।

বুলু বিরক্ত হইয়া বলিল—কতবার বলবি ?

অনিল কহিল—তবু আর একবার তোকে মনে করিয়ে দিলাম। তুই যেমন চঞ্চল। আস্তে যাস্—মা-কালী !

অনিল চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল বটে, কিন্তু শরীরের প্রত্যেকটি রক্ত-বিন্দু সজাগ করিয়া সে বুলুর গতিবিধি দেখিতে লাগিল। পা টিপিয়া-টিপিয়া বুলু মাটিতে নামিয়াছে, ঘুমন্ত গণেশের দিকে বারে-বারে চাহিতে-চাহিতে সে দরজার কাছে আগাইল। গা পাতিয়া যখন সে দরজার একটা ধার চাপিয়া ধরিয়াছে—সাবাস্ বুলু—দেখিতে-দেখিতে অত্যন্ত আলগোছে খিলটা খুলিয়া আসিল। খিলটা আস্তে-আস্তে নামাইয়া রাখিয়া তাহার চেয়েও আস্তে-আস্তে সে দরজা খুলিল। ঘরে-বাহিরে স্তব্ধতার সঙ্গে গভীর অন্ধকার। বুলুর পা কাঁপিল না, বাহিরের অন্ধকারে সে যেন স্পষ্ট তাহার মাকে দেখিতে পাইল। মা তাহার শিরিষ গাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এই সেই শিরিষ গাছের তলা—দাদা তাহাকে আগেই দেখাইয়াছিল। সেইখানে আসিয়া মা'র আর চিহ্নটুকুও সে দেখিতে পাইল না। অন্ধকারে গা তাহার পাথরের মত ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। বনের মধ্য দিয়া লতা-পাতায় খস্ খস্ করিতে-করিতে একটা সাপ চলিয়া গেল হয় ত'—সারি-সারি গাছগুলি ভূতের মত এক ঠ্যাঙে দাঁড়াইয়া তাহাকে মুখ ভ্যাঙচাইতেছে। দাদা মা-কালীকে ডাকিতে বলিয়াছিল, কিন্তু যে-দেবী কচি শিশুর রক্ত খাইবার জন্য জিহ্বা মেলিয়াছেন তাঁহাকে সে মরিয়া গেলেও ডাকিতে পারিবে না।

কিন্তু দাদাটা এখনও আসিতেছে না কেন? তাড়াতাড়ি আসিতে গিয়া সর্দার-মাঝির গা মাড়াইয়া দিয়াছে বুঝি? সে ভয়ে ভয়ে চোখ বুজিয়া এখানে আর কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে? আবার শুক্‌নো পাতায় কাহার পায়ের শব্দ হইল? টের পাইয়া গণেশই বুঝি নিজে বাহির হইয়া পড়িয়াছে! বুলু চীৎকার করিতে যাইতেছিল, কিন্তু চোখ চাহিয়া দেখিল—দাদা!

দীর্ঘ দিন-রাত্রির অকূল সমুদ্র-যাত্রার পর কলম্বাস্ যখন প্রথম তীররেখা দেখিয়াছিল, ঠিক তাহারই মত আনন্দে বুলু লাফাইয়া উঠিল।

অনিল তাহাকে ইসারায় বলিল—পালা!

বুলু একটি মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করিল, তারপর দাদা শিরিষ গাছটার কাছে আসিয়া পেঁ ৗছিতেই দুইজনে বন ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। গাছপালা তাহাদের বাধা হইল না, অন্ধকার অনায়াসে তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিল। আকাশের তারাগুলি রুগ্ন সন্তানের শিয়রে মা'র নিষ্পলক চোখের মত তাহাদের ডাকিতে লাগিল—আয়, আয়, আয়!

কতক্ষণ যে তাহারা কোন্ পথে ছুটিয়াছে কিছুই খেয়াল নাই—কাঁটা-লতায় আটকাইয়া পা দুইটা ছড়িয়া রক্ত বাহির হইয়া গেল, তবুও থামিলে তাহাদের চলিবে না। গুপী কোন দিকে যে নদীর পথ দেখাইয়া দিয়াছিল অন্ধকারে তাহার কোন নির্দেশ পাওয়া গেল না—কেবল বনের সঙ্গে বন, অন্ধকারের সঙ্গে অন্ধকার মিলিয়া-মিশিয়া সমস্ত পৃথিবী একাকার করিয়া দিয়াছে। তবু কেবলই বুলুর মনে হয় আর দু' কদম ছুটিয়া যাইলেই সামনে কলিকাতার রাস্তা মিলিয়া যাইবে—এখন রাস্তা ভরিয়া গ্যাস জ্বলিতেছে—ময়লা-গাড়িগুলি শব্দ করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, দুই একটা বাসও যে না পাওয়া যাইবে এমন নয়। কিন্তু কোথায় কলিকাতা! কোথায় বা মা তাহাদের জন্য বিছানা করিয়া বসিয়া আছেন! খালি বনের পর বন, আর অন্ধকারের পর অন্ধকার! সেই অন্ধকার সমুদ্রের চেয়েও বিশাল, সেই বন মৃত্যুর চেয়েও অপরিচিত। বুলু থামিয়া পড়িল; কাঁদিয়া কহিল—আর চলতে পারছি না, দাদা।

অনিল ধমক দিয়া কহিল—চলতে না পারলে হ'বে কেন? ঐ ওরা যে এসে পড়ল তাড়াতাড়ি!

দিগ্বিদিক না তাকাইয়া বুলু আবার ছুটিল। সত্যই, পিছনে যেন কাহারা আসিতেছে—এই তাহাদের ধরিয়া ফেলিল বুঝি। প্রাণপণে যত তাহারা ছোটে, সেই সব পদশব্দ ততই যেন আগাইয়া আসিতে থাকে। তাহারা সেই তালগাছের দিকে না গিয়া নদীতে আসিয়া নৌকা ধরিবার জন্য এই বনের পথ নিল কেন? কোথায় যাইতে এই কোথায় আসিয়া পড়িল। চারিদিক হইতে শৃগাল ডাকিয়া উঠিয়াছে—যদি দল বাঁধিয়া আক্রমণ করিতে আসে! আসিবার সময় গণেশের বালিশ হাতড়াইয়া দেশলাইয়ের বাক্সটা বুদ্ধি করিয়া নিয়া আসিল না কেন? গণেশ হয় ত' তাহা হইলে খপ্ করিয়া ঘাড়টা ধরিয়া ফেলিত! যা হউক, তবু ত' তাহারা বাহির হইতে পারিয়াছে—ডাকাতদের রক্তবর্ণ চক্ষু হইতে এই অন্ধকার বরং ভাল। এই অন্ধকার কোন সময় নিশ্চয় ফর্সা হইবে, কিন্তু ডাকাতদের মুঠি কখনও আল্গা হইত না।

অনিলও আর চলিতে পারিতেছিল না। গাছের একটা গুঁড়ি ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল, কহিল—আয় বুলু, একটু জিরোই।

বুলু বসিয়া কহিল—পায়ে প্রকাণ্ড একটা কাঁটা বিঁধে গেছে, দাদা।

অনিল কহিল—আমারই কি বেঁধেনি নাকি? জুতো পায়ে ত' বের হওয়া চলত না। আর এখানে কে আমাদের জন্যে গাড়ি তৈরি রেখেছে?

বুলু ম্লান মুখে কহিল—তা' ত' জানি। কিন্তু কোথায় আমরা যাচ্ছি? কি উপায় হ'বে, দাদা?

বুলুকে নিজের কোলে শোয়াইয়া দিয়া অনিল কহিল—উপায় আর কী! প্রাণ ভরে' মা-কালীকে ডাক্ বুলু, তিনিই রক্ষা করবেন।

নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বুলু দাদার কথামত মা-কালীকেই ডাকিতে লাগিল। পাছে প্রাণ ভরিয়া ডাকা না হয় সেই ভয়ে বুলু উচ্চস্বরে মা-কালীর নাম ধরিয়া আর্তনাদ শুরু করিল। অনিল ধমক দিল—চ্যাঁচাচ্ছিস কেন? মনে-মনে ডাকলেও তিনি শুনতে পান। পরে বুলুর পায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিল—একটু ফর্সা হ'লেই আবার আমরা বেরুব। পথ-ঘাটের তখন একটা কিনারা পাওয়া যাবে। নদী নিশ্চয়ই বেশি দূরে নয়। নৌকো করে'—

অনিল আর চলিতে পারে না—নৌকা করিয়া বুলুকে লইয়া সে মনে-মনে নদী পাড়ি দিয়া চলিল। রূপালী নদীতে সোনার রোদ ঝিকমিক করিতেছে। এবারের মাঝি বিনা-পয়সায় তাহাদের ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে!

চোখ বড় করিয়া বুলু বলিল—নৌকো পেলে মাঝিকে আমার গলার হারটাই বক্‌শিস দিয়ে দেব।

হ্যাঁ, এবার ষ্টীমারে উঠিতে পারিলে তাহাদের পায় কে!

কতক্ষণ পরে দেখা গেল লণ্ঠন-হাতে কে একজন বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আলোটা তাহাদেরই দিকে আগাইয়া আসিতেছে দেখিয়া বুলু অনিলকে জড়াইয়া ধরিল, কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিল—ঐ ওরা এসে পড়ল, দাদা—কি হ'বে?

শুকনো গলায় অনিল কহিল—ওদের কেউ নাও হ'তে পারে। মা-কালী, ও যেন অন্য লোক হয়, ওকে তুমি অন্য লোক করে' দাও।

লোকটার একটি বাছুর হারাইয়াছে। সারারাত ধরিয়া গরুর ডাক শুনিয়া সে ঘুম হইতে উঠিয়া গোয়াল ঘরে আসিয়া দেখে বাছুরটি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। সেই বাছুর খোঁজ করিতেই সে লণ্ঠন নিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। দূরে গাছের তলায় কি একটা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে সেই-দিকে পা চালাইল।

অনিল ও বুলু ততক্ষণে ভয়ে কাঠ হইয়া গিয়াছে।

লোকটা হাঁকিল—কে ওখানে? কে?

স্বরটা ডাকাতদের বলিয়া মনে হইল না। অনিল কহিল—আমরা।

—আমরা কে রে? লোকটা কাছে আসিয়া দেখিল দুইটি নিঃস্ব ছেলে-মেয়ে গাছের তলায় বসিয়া আছে। সে উহাদের মুখের কাছে লণ্ঠন তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে তোমরা? কি করছ এখানে?

অনিল কহিল—আমরা নদীর ঘাটে যাব—পথ দেখিয়ে দিতে পার?

—আসছ কোত্থেকে?

—পথ ভুলে এইখানে এসে পড়েছিলাম—এবারে ফিরে যেতে চাই! তুমি আমাদের একটু উপকার করবে না?

বুলু কথা কাড়িয়া কহিল—তোমাকে বক্‌শিস দেব।

অনিল্ তক্ষুনি তাহাকে গোপনে এক চিমটি কাটিয়া দিল। বুলুর তখন হুঁস হইল, সত্যই সে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া ভাল করে নাই। এই লোকটাকেই যদি সে সোনার হার বক্‌শিস্ দিয়া দেয়, তবে মাঝি কিসের লোভে তাহাদের নৌকা করিয়া ষ্টীমার ধরাইয়া দিবে ?

কথাবার্তা শুনিয়া লোকটার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল। কহিল—এখানে পথ ভুলেই বা কি করে' এলে ? আমাকে সব কথা খুলে বল, খোকা। তোমাদের কিচ্ছু ভয় নেই।

বুলু নির্ভরশীল চক্ষু তুলিয়া দাদার দিকে তাকাইয়া রহিল। ঢোক গেলা ছাড়া অনিল কিছুই বলিতে পারিল না।

লোকটি আবার কহিল—বিপদে যদি পড়ে' থাক, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের উপকার করব। কিন্তু আগে তোমাদের পরিচয় দাও। ভদ্দরলোকের ছেলে বলেই ত' মনে হচ্ছে। কোথায় বাড়ি ? কী করে এখানে এলে ?

অনিল আমতা আমতা করিয়া কহিল—আমরা মুন্সিগঞ্জে দাদামশায়ের বাড়ি যাচ্ছিলাম। নদীতে ঝড় উঠলে মাঝিরা ডাকাতি করে' আমাদের দু'জনকে এখানে নিয়ে এসেছে। মা-বাবাকে কোন্ একটা চরে ফেলে রেখে এসেছে। আমরা দু'জনে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসেছি—

লোকটা অবাক হইয়া কহিল—বল কী ?

অনিল বলিল—এখন আমরা ষ্টীমার ধরতে চাই—কাঁটার খোঁচা খেয়ে গা আমাদের রক্তে ভেসে যাচ্ছে, আর আমরা চলতে পাচ্ছি না। আমাদের ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছে দিতে পার ? আজ রাত্রেই— এক্ষুনি ?

বুলু কান্নায় গলিয়া গিয়া কহিল—আর দেখেছ, আমার এই পাটা। কিছু আর নেই। তেষ্টায় গলা বুজে আসছে—এক গ্লাস জল খাওয়াবে ?

জলের বদলে বুলু আবার একটা চিমটি খাইল। আবার সে ভুল করিয়া বসিয়াছে। এখন জল খাইতে গেলে ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছিতে যে দেরি হইয়া যাইবে। ততক্ষণে তাহারা যদি আসিয়া পড়ে !

লোকটা কহিল—এস আমার সঙ্গে। কাছেই আমার বাড়ি—জল খাওয়াব, চল। বনের মধ্যে কি পড়ে' থাকে ? সাপখোপের ভয় আছে যে ! ওঠ।

অনিল আপত্তি করিয়া কহিল—না, জলতেষ্টা আমাদের সত্যিই তত

পায়নি। ওটুকু আমরা সইতে পারব। আমাদের একবার তুমি ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছে দাও, দয়া করে'।

—দেব বৈ কি। নিশ্চয়ই দেব। আমার ওখানে গিয়ে জল-টল খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নাও—ওখানে যে আছ কারুর বাপের সাধ্য নেই টের পায়। যেখানে-যেখানে কেটেছে সব জায়গায় আমি ওষুধ লাগিয়ে বেঁধে দেব। আমার ওখানে ইচ্ছে করলে একটু ঘুমিয়েও নিতে পারবে। টাট্‌কা গরুর দুধ জাল দিয়ে দেব—সরু চিঁড়ে আর অমৃত-সাগর কলাও ঘরে আছে। চল, খুকি।

বুলু আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। দাদা তাহার ব্যবহারে রাগ করিয়াই বুঝি মুখ ভার করিয়া তেমনি বসিয়া আছে।

লোকটা কহিল—এইখানে বসে' থাকলে লাভ কী? ওরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছে। চুপ করে' বসে' থাকবার পাত্র ত' ওরা নয়। এই দিকেই বা কোন্ না কেউ এসে পড়বে। শীগ্‌গির চল খোকা, আমিই বরং তোমাদের লুকিয়ে রাখতে পারব। তারপর সুবিধে বুঝে ঠিক একসময় ষ্টীমার-ঘাটে পৌঁছে দিয়ে আসব, সুড়্‌সুড়্ করে' বাড়ি চলে' যাবে।

এ একটা যুক্তির কথা বটে। দাদাকে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিতে দেখিয়া বুলুর চোখ খুসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রাণ লইয়া পলাইবার সময় পা দুইটা বল্‌গাহীন ঘোড়ার মতই ছুটিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু এখন মনে হইল দুই পায়ে কে যেন প্রকাণ্ড বেড়ি বাঁধিয়া দিয়াছে—পা আর উঠিতে চায় না। অতি কষ্টে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে লণ্ঠনের আলো লক্ষ্য করিয়া দুইজনে নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল।

গহন অন্ধকারের কিনারে এতক্ষণে বুঝি ক্ষীণ একটি আলোর রেখা দেখা গেল। বুলু দাদার গা ঘেঁষিয়া চলিতে চলিতে কহিল—কালী বেশ ভাল দেবতা, না দাদা?

অনিল বলিল—নিশ্চয়। প্রাণ ভরে' ডাকলে সব দেবতাই সাড়া দেন।

—কী ডাকাটা ডাকলাম বল দিকি। সাড়া না দিয়ে পারে? তবে বোধহয় আমার রক্ত আর ও খাবে না, দাদা।

নিঃশব্দে বাকি পথটুকু পার হইয়া আলোর সঙ্গে-সঙ্গে উহারাও থামিল।

ঘন গাছপালার মাঝখানে ছোট কয়েকখানি পাতার কুঁড়ে ঘর। রাত্রে গরম বলিয়া একজন লোক উঠানে খাটিয়া পাতিয়া পরম আরামে ঘুমাইতেছে। বুলুদের পথ দেখাইয়া যে আনিতেছিল সে ডাকিল—রতন!

ডাক শুনিয়া রতন ধড়মড় করিয়া উঠিল। চোখ কচ্‌লাইয়া কহিল—কে, বংশী-দাদা না? বাছুর পেলে?

বংশী হাসিয়া কহিল—তার চেয়ে ভাল জিনিস পেয়েছি, ছাখ্‌। আমাদের বাছুরটার মতই মা-হারা হয়ে পথে বেরিয়েছে। তুই এখন একবারটি যা ত' বাপু, এদের জন্যে গয়লা-বৌর থেকে কিছু পাটালি-গুড় আর পাতক্ষীর নিয়ে আয় দিকি। ভদ্দরলোকের ছেলেপিলে সব—অভুক্ত হয়ে ঘরে অতিথি হয়েছে—কীই বা এই অসময়ে সামনে দিই বল ত'!

বলিয়া বংশী রতনকে কাছে ডাকিয়া কী-সব উপদেশ দিতে লাগিল। পরে বুলুদের দিকে তাকাইয়া কহিল—এস আমার সঙ্গে এই ঘরে। একটু ঘুমিয়ে নেবে। বলিয়া রতনের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়িল—আসবার সময় নৌকো একটা বায়না করে' আসিস্—এদের আবার ইষ্টিশানে পৌছে দিতে হ'বে।

রতনের আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু বংশীর মিষ্টি ব্যবহারে দুই ভাই-বোনের মন গলিয়া গেল। মা-কালী উহাদের পথ দেখাইয়া নিতে নিজের অনুচর পাঠাইয়া দিয়াছেন। অনিল কহিল—এখানকার ষ্টীমার-ষ্টেশনের নাম কি? ষ্টীমার লাগে কখন?

—তা লাগতে এখন ঘণ্টা চারেক বাকি। তোমরা স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে চারটি খেয়ে নিতে পারবে। কোথায় তোমাদের লেগেছে, দেখি? বলিয়া আলো লইয়া বংশী উহাদের পায়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

নিতান্ত লজ্জিত হইয়া অনিল কহিল—ও আর এমন কী লেগেছে? তোমার ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। খেলতে গিয়ে এমন কত আমার কেটে যায়।

বুলু গলা তুলিয়া কহিল—কত!

অনিল জিজ্ঞাসা করিল—ষ্টীমার-ষ্টেশনের নাম কি নারায়ণগঞ্জ? না, এখানে চড়লে সেখানে আমাদের নামতে হ'বে? একেবারে এখান থেকেই বরাবর নৌকো করে' নারায়ণগঞ্জ যাওয়া যায় না?

বংশী বলিল—সে তোমাদের ভাবতে হ'বে না। আমি ঠিক তোমাদের

পৌঁছে দেব। একবার আমার হাতে যখন এসে পড়েছ তখন আর তোমাদের ভয় নেই।

বুলু উৎফুল্ল হইয়া কহিল—তবে যাবার সময় সেই চরটাও একবার ঘুরে যাব, কেমন? যদি মা-বাবা সেখানে থাকেন তাদেরকেও তুলে নেব সঙ্গে। কী মজাটাই যে হ'বে।

অনিল তাহাকে ধমক দিয়া কহিল—দূর বোকা! তাঁরা সেখানে এখনও বসে' আছেন নাকি? কখন্ বাড়ি চলে' গেছেন—

—বাড়ি চলে' গেলে বুঝি আমাদের খোঁজে লোকে পাঠাতেন না?

—পাঠাননি তুই কী করে' বুঝলি? এখানে পথ চিনে একদিনে চলে' আসা খুব বুঝি সোজা ভাবছিস?

—তবু চরটা একবার ঘুরে যেতে দোষ কী!

—সেই চর কে বা'র করবে? তুই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবি?

সত্যিই, সে-কথা বুলু ভাবিয়া দেখে নাই। তবু না দমিয়া সে কহিল—বেশ ত', ওঁরা যদি সেই চরে না থাকেন, বাড়ি গিয়েই ত' দেখা হ'বে। বুঝলি দাদা, খুব হৈ-চৈ করে' বাড়ি ঢুকব না, পেয়ারা গাছের ডাল ধরে' পেছনের দেয়াল টপকে দু'জনে নেমে পড়ে' রোয়াকটিতে চুপটি করে' বসে' থাকব। গয়লা দুধ দিতে এসে যখন সদরের কড়া নাড়বে তখন দরজা খুলতে এসে মা'র চক্ষু স্থির। আমরা মাকে প্রথম চিনতেই পারব না, না দাদা? হ্যাঁ, এদিককার ট্রেন খুব ভোরেই ত' শেয়ালদা পৌঁছয়—না বংশী খুড়ো?

বংশী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল—তুমি যখন বলবে সেই সময়ই ট্রেন তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বুলু কহিল—তা' কী করে হয়? ট্রেন তোমার কথা শোনবার জন্যে বসে' আছে!

অনিল বলিল—হ্যাঁ, ঢাকা-মেল খুব সকালে গিয়ে পৌঁছয়। কাল আমরা এমন সময় কী করছি বল ত'—

তক্তপোষের উপর বসিয়া বুলু জোরে জোরে পা দুলাইতে লাগিল—কাল যে তাহারা এমন সময় ঠিক কী করিবে, কী করিলে যে ঠিক তাহাদের মানাইবে, বুলু সহসা কিছু ভাবিয়া পাইল না।

বংশী তক্তপোষের উপর একটা ছেঁড়া সতরঞ্চি বিছাইতে-বিছাইতে কহিল—আমি দুটো বালিশ এনে দিচ্ছি, তোমরা একটু ঘুমিয়ে নাও! রতন খাবার নিয়ে এলেই মুখ হাত ধুয়ে ততক্ষণে খেতে লেগে যাবে। আমিও কোমরে গামছা বেঁধে তৈরি হয়ে নেব। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গা ছড়াইবার এমন সুযোগ পাইয়া দুই ভাই-বোন সতরঞ্চির উপর নিশ্চিন্ত আরামে এলাইয়া পড়িল এবং দেখিতে-দেখিতে বুলুর দুই চোখ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ঘুমাইলে অনিলের চলিবে না, কতক্ষণে ভোর হয় সেইজন্য তাহার প্রতীক্ষা করিতে হইবে—ভোর হইলেই ঝির-ঝিরে হাওয়ায় রঙচঙে পাল ফুলাইয়া নৌকা ভাসিয়া চলিবে!

খানিকক্ষণ বাদে ঘরের পিছনে অনেকগুলি চাপা গলার স্বর ও দ্রুত পায়ের শব্দ শুনিয়া অনিল খাড়া হইয়া উঠিল—বুলু কিন্তু তখনও পাতার আড়ালে কুঁড়িটির মত ঘুমাইতেছে। অনিল স্পষ্ট দেখিল কতকগুলি লোক সোজা এই বাড়িরই উঠানে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—জাঁদরেল, জোয়ান সকলের চেহারা—সকলের আগে রতন, সে এইমাত্র তাহাদের জন্য পাতক্ষীর আনিতে গয়লা-বৌর বাড়ি যাইবার নাম করিয়া বাহির হইয়াছিল। প্রথমটায় অনিল কিছুই বুঝিতে পারিল না।

ঠিক হরলালের গলা—অনিলের চিনিতে আর দেরি হইল না। কী যে করিবে, বুলুকে জাগাইবে কি না, কিছুই আয়ত্ব করিতে না পারিয়া অনিল তক্তপোষের তলায় গিয়া লুকাইল। তক্তপোষের তলায় গিয়াই তাহার মনে হইল কাজটা নিতান্তই কাপুরুষের, কিন্তু ঘরের মধ্যে ততক্ষণে হরলাল সদলবলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

হরলাল বংশীর কাঁধ চাপড়াইয়া কহিল—ঠিক বন্ধুর কাজ করেছ ভাই—তোমাকে এর জন্যে ঢের ইনাম দেওয়া যাবে। কৈ, ও দুটো কোথায়?

বংশী কহিল—ঐ তক্তপোষের ওপরে। বলিয়া লণ্ঠনের আলোতে পথ দেখাইয়া উহাদের ভিতরে নিয়া আসিল।

বংশী ঠিক উপযুক্ত বন্ধুরই কাজ করিয়াছে বটে। দুইটি নিরাশ্রয় পলাতক শিশুকে ডাকাতের হাতে আবার তুলিয়া দিয়াছে। নদীর রাস্তা দেখাইয়া দিলে বুলু তাহাকে বক্‌শিস্ দিবার লোভ দেখাইয়াছিল, বংশী মনে-মনে তখন

হাসিয়াছিল মাত্র। বকৃশিসের মাত্রাটা কোথায় গিয়া ঠেকিতে পারে তাহাই জানিবার জন্য সে রতনকে চুপি-চুপি ডাকাতের আড্ডায় পাঠাইয়া দিয়াছে! ক্ষুধার্ত শিশু দুইটির জন্য সে এতক্ষণ বলকতোলা টাট্‌কা দুধ ও সরু চিঁড়ের সঙ্গে অমৃতভোগ কলারই ফলার যোগাড় করিতেছিল বৈ কি! আর, দুইটি ভাই বোন এতক্ষণ মনের পাখা মেলিয়া প্রায় তাহাদের বাড়ি পৌছিয়া গিয়াছিল! পেয়ারা গাছের ডাল ধরিয়া দেয়াল টপকাইয়া তাহারা দুইজনে রোয়াকে বসিয়া দরজার কাছে মা'র আবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

বন্ধু না হইলে কেহ কি আর এমন করিয়া বাড়িতে আশ্রয় দেয়, পায়ের ঔষধ লাগাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে!

সনাতন রুখিয়া আসিয়া কহিল—মেয়েটা ত' শুয়ে আছে দেখছি—ছোঁড়াটা কোথায় গেল?

বংশী স্তম্ভিত হইয়া কহিল—এই ঘরেই ত' ছিল। যাবে কোথায়? বলিয়া সে নীচু হইল। তক্তপোষের তলার অন্ধকারে অনিল ঘুপটি মারিয়া বসিয়া আছে। বংশী হাসিয়া কহিল—বাছাধন, একবার বেরিয়ে আসুন দয়া করে'।

হরলাল তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া বাহির করিল ও রাগে অন্ধ হইয়া দাঁতে মুখে মাথায় বুকে যেখানে যত পারিল বেদম ঘুষি মারিতে লাগিল। দেখাদেখি সনাতন ঘুমন্ত বুলুর উপর তাহার ঝাল ঝাড়িতে উদ্যত হইল।

গণেশ এতক্ষণে কথা কহিল—খবরদার, ওর গায়ে হাত তুলবি নে। যত পারিস, ছোঁড়াটাকে পেট্, কিন্তু ওর কাছ থেকে সরে' দাঁড়া।

সনাতন সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—এমন বেয়াদবির পরেও তুই ওদের শাসন করতে দিবি নে?

গণেশ বলিল—মারলেই বুঝি খুব শাসন হ'ল? ছেলেপুলের বাপ ত' কোনদিনই হ'স নি?

সনাতন মুখ ভেঙ্‌চাইয়া কহিল—আর শাসন হয় আদর করলে! ঠেসে আদর করেই ত' মেয়েটার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিস। দেব কালীর কাছে বলি দিয়ে—বলিয়া সনাতনও অনিলের পিঠে এক লাথি বসাইয়া দিল।

বংশীও সাহস পাইয়া তাহার কানটা মলিয়া দিয়া কহিল—ছোঁড়াটাকি কম পাজী! বলে কি না ষ্টীমার-ষ্টেশনের নাম নারায়ণগঞ্জ।

চারিদিকের এই সমবেত প্রহারের ঝাপটায় হাড় ক'খানা একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল—আর সে শুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার তীক্ষ্ণ চীৎকারে এতক্ষণে বুলুর ঘুম ভাঙিয়াছে। গণেশ তাড়াতাড়ি তাহার মুখের উপর ঝুঁইয়া পড়িয়া কহিল—কিছু ভয় নেই বুলু, এই যে আমি, এখানে।

বুলু অস্পষ্ট আলোতে গণেশকে ঠিক চিনিল, কিন্তু সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে চোখ মেলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে বুঝি। সে আর দাদা না এতক্ষণ বাড়ি পৌঁছিয়া মা'র হাতের চা খাইতেছিল? কোথা দিয়া এ আবার কি হইয়া গেল? পাগলা কুকুরের মত উহারা দাদাকে টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলিবে নাকি?

গণেশ কহিল—বাড়ি গিয়ে ঘুমুবে চল, বুলু।

হরলাল ক্ষেপিয়া কহিল—মেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে ত' তুইই এই কাণ্ডটা বাধালি। আর আদরে কাজ নেই। হাটে গিয়ে ফৈজু মিয়াঁকে একটা খবর দিতে পারবি, বংশী? তার জন্যে মাল মজুত—খুব চড়া দামের জিনিস।

বংশী স্বচ্ছন্দে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—আজই ত' হাট-বার। যাব নিশ্চয়।

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল—কোন জায়গায় ওদের তুই দেখা পেলি?

—সেই পিপুল-গাছের গোড়ায়। বাছুর খুঁজতে বেরিয়েছিলাম—

—বলিস কি রে? হরলাল সবিস্ময়ে কহিল—আর একটু এগোলেই ত' নদী। নদী পেলেই ত' প্রায় সরে' পড়েছিল আর কি। বলিয়া অনিলের গাল বাড়াইয়া সজোরে এক চড় বসাইয়া দিল।

বুলু কহিল—দাদাকে আমিই ত' পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওকে একলা মারছ কেন?

হরলাল চক্ষু পাকাইয়া কহিল—তোমারও ব্যবস্থা হচ্ছে, চল না।

অনিলের চলিবার আর শক্তি ছিল না, অগত্যা সনাতন তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল। বুলু ত' গণেশেরই কাঁধে। কাঁধে উঠিয়াও অনিলের নিস্তার ছিল না—যাইবার আগে বংশী একবার মুখ ভেঙচাইয়া বলিল—কি যাদু, কলা খেলে কেমন?

হরলাল একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল—অনিলের এই দুঃসাহসিক আচরণ সহজে সে হজম করিতে পারিবে না। একটা কিছু প্রতিবিধান আজই করিতে

হইবে। স্বয়ং গণেশের চোখে ধূলা দিয়া ইহারা বাহির হইয়া গেল, আর ইহাতে কি না তাহার এক ফোঁটা রাগ নাই। বরং মেয়েটাকে যে ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে তাইতেই সে খুসি? মেয়ে নিয়া অত আবদার যেন সে আর না করে! দু'তিন দিনের মধ্যেই ফৈজু সাহেব আসিয়া পড়িবে।

গণেশকে ডাকিয়া লইয়া তিনজনে পরামর্শ করিতে লাগিল। ঠিক হইল যে, কাল রাত্রে অনিলকেই কালী-মন্দিরে বলি দেওয়া হইবে—গণেশের মুখের দিকে চাহিয়া বুলুর কথা আর কাহারও মুখেই আসিল না। তাহা ছাড়া ছেলেটিকে বেশি দিন কাছে রাখাও নিরাপদ নয়—যেমন সাহসী তেমনি বুদ্ধিমান! ছুরির ধারাল ফলার মত চোখ দুইটা চক্ চক্ করিতেছে—দৃষ্টির সারল্যের মাঝে কোথায় একটা তীক্ষ্ণ দীপ্তি ছিল। না, উহাকে আর আস্কারা দিয়া লাভ নাই। 'বম্ ভোলানাথ' বলিয়া কাল রাত্রেই উহাকে সাবাড় করিয়া ফেলা হউক।

আর বুলুকে অবশ্য ফৈজুর কাছে বিক্রয় করা হইবে—রতন হাটে যাইয়া তাহাকে আজ খবর দিয়া আসিবে। যেদিন সে আসে—আর কথা নাই। কথাটা আগে হইতেই ঠিক হইয়া আছে বটে, তবু এইবার একেবারে পাকা করিয়া নেওয়া গেল। আর টাল-মাটাল চলিবে না। তাহা ছাড়া মেয়েটা দস্তুরমত গণেশের মন ভিজাইয়া দিয়াছে—এই অস্বাস্থ্যকর মনোভাব থেকে সর্দারকে মুক্ত হইতে হইবে। অবশ্য মেয়েটাকে হরলাল নৌকার মধ্যে রাখিয়া আসিলেই পারিত, তবু আনিয়া যখন ফেলিয়াছে, তখন নিশ্চয় একটা গতি করিতে হইবে। দুর্দিনে যা' দুই পয়সা হাতে আসে—তাহাই লাভ!

—কী বল গণেশ?

গণেশ রাজি না হইয়া আর কী করিবে? বুলুকে বেচিয়া যা' দু' পয়সা হাতে আসে, পৃথিবীতে তাহারই দাম ত' এতদিন তাহারও কাছে বেশি ছিল। আজ আপত্তি করিলেই বা মানাইবে কেন? কিন্তু ফৈজু কত দাম দিবে—এই রত্নের দামই বা সে কষিবে কী করিয়া! অতশত বিচার করিয়া আর লাভ কি, দুর্দিনের বাজারে কাণাকড়ি যা পাওয়া যায় তাহাই লাভ! না, গণেশের মত, আছে বৈ কি। একটা কচি মেয়ের মুখ দেখিয়া তাহার নরম হইলে কি চলে? কত অমন কচি মেয়ের মাথা সে দুই পায়ে মাড়াইয়াছে।

গণেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তাই হোক্, মিছিমিছি তবে ছেলেটাকে আর বেঁধে রাখিস্ কেন? কালই যখন ওর শেষ, তখন আজ অন্তত একটু হাত পা ছড়িয়ে ছুটোছুটি করুক। দুটো ভাল কিছু ওকে খেতে দে—এ জন্মের লীলা-খেলা ত' ওর ফুরোল!

হরলাল কহিল—তাতে আর আপত্তি কি? কী বল্ সনাতন? চন্দ্রবদন আজ আর পালাতে পাচ্ছেন না, সারাক্ষণ কাছে-কাছে রাখব।

হরলাল সনাতনকে লইয়া ঘরের পিছনে বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। সেখানে মোটা একটা বাঁশের সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়া অনিলকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা হইয়াছে। বাঁধনের জায়গাগুলির পাশে-পাশে শরীরের মাংসগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে—সর্বাঙ্গে দুঃসহ বেদনা, মাথা আর সে খাড়া রাখিতে পারিতেছে না। তবু এত দুঃখের মাঝেও এই ভাবিয়াই তাহার সবচেয়ে বেশি দুঃখ হয় যে, ঐ পিপুল-গাছের তলায় না বসিয়া সোজা আরও খানিকটা হাঁটিয়া গেলেই তাহারা নদী পাইত—হয় ত' এতক্ষণে তাহারা ষ্টীমারে উঠিয়া রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া ঢেউয়ের শব্দ শুনিতেছে!

চোখের সামনে বিকটাকার হরলালকে দেখিয়া অনিলের সমস্ত শরীর ভয়ে ও বেদনায় হিম হইয়া গেল—হরলালের হাতে একটা ছুরি; হয় ত' তাহাকে এখন খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া মাংসের টুকরাগুলি তাহার পোষা কুকুরটাকে খাইতে দিবে। কিন্তু সে কাছে আসিয়া কিনা ছুরি দিয়া দড়ির বাঁধনগুলি কাটিয়া দিতে লাগিল। অনিল যেন চোখের সামনে ম্যাজিক দেখিতেছে।

এদিকে গণেশ আসিয়া বুলুকে বলিল—তোমার দাদার বাঁধন খুলবার হুকুম দিয়ে এলাম। আমাকে তুমি এখন কী দেবে বল দিকি, খুকি?

বুলু খুসি হইয়া কহিল—সত্যি ছেড়ে দিয়েছ দাদাকে? তুমি খুব ভাল, সর্দার। কী আর তোমাকে দেব? বড় হয়ে যখন ডাক্তার হ'ব তখন তোমাকে—যা তুমি চাও—পাঠিয়ে দেব। কী তুমি চাও, বল না?

বুলুর চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে গণেশ বলিল—বড় হয়ে তুমি ডাক্তার হ'বে বুঝি?

—হ্যাঁ, কিন্তু কী করেই বা হ'ব? তোমরাই ত' হ'তে দেবে না—কাল রাত্রে ত' আমাকে মা-কালীর কাছে বলি দেবে। মা-কালী একটুও ভাল

নয়, সর্দার। এত করে' তাঁকে ডাকলাম, তবু তিনি হাত ধরে' আমাদের বাড়ি নিয়ে গেলেন না। আমি মরে' গেলে দাদাকে কিন্তু তুমি দেখ, এরোপ্লেনে চড়ে' বিলেত যাবার ওর ভারি সখ্। বিলেত থেকে ও প্রকাণ্ড ইঞ্জিনিয়ার হয়ে আসবে। ও হরি—তুমি বুঝি এরোপ্লেন চেন না!

যতক্ষণ বুলু কথা বলে গণেশ মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে, বাধা দিতে মন উঠে না। বুলু থামিলে গণেশ বলিল—আমি বেঁচে থাকতে কারুর সাধ্যি নেই তোমাকে বলি দেয়!

—বল কী, সর্দার? তুমি এত ভাল? বলিয়া বুলু দুই হাতে গণেশকে জড়াইয়া ধরিল।

শিশুর সেই কোমল স্পর্শে কঠিন পাথর নিমিষে মাখন হইয়া গেল। গণেশ কহিল—এইবার তবে তুমি খাও। আর কতক্ষণ উপোষ করে' থাকবে? ঐ যে তোমার দাদা এসে পড়েছে। দেখ, আমার কথা সত্যি কি না।

অনিল বুলুর দিকে তাকাইতে পারিতেছে না, ছোট বোনটির কাছে সে কত যেন অপরাধী—কষ্ট করিয়া বনের মধ্য দিয়া আর একটু অগ্রসর হইলেই ত' সে বুলুকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারিত! বাবুগিরি করিয়া কেন সে তখন বিশ্রাম করিতে বসিল? অথচ খানিক আগে বুলু থামিতে চাহিলে সে-ই গলা বড় করিয়া তাহাকে ধমক দিয়াছে। চোখ ঠেলিয়া জল বাহির হইয়া আসিতেছে, অনিল প্রাণপণ শক্তিতে সে জলের স্রোত বন্ধ করিল। এখন কাঁদিলে বুলু অকারণে আরও অস্থির হইয়া পড়িবে। সে এখনও আশা হারায় নাই—নিশ্বাসের বাতাসের মত মা'র আশীর্বাদ তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে।

অনিলকে দেখিয়া বুলু কহিল—আয় দাদা, খাবি আয়। আর ওরা তোকে মারবে না—কেমন, ঠিক ত' সর্দার? আমাকেও বলি দেবে না বলেছে। সর্দার খুব ভাল লোক, দাদা।

গণেশ মেঝের উপর খাবারের থালা সাজাইয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর ঝুঁকিবার আগে হঠাৎ বুলু কহিল—আমরা খাবনা ত'—কক্‌খনো খাবনা।

বুলুর কথা শুনিয়া অনিলও হটিয়া আসিল। গণেশ কহিল—কেন? এ ত' খুব ভাল খাবার।

হোক্ ভাল খাবার। কিন্তু গুপীকে তোমরা বেঁধে রেখেছ কেন? ও কী দোষ করল? আমাদের জন্যে কেন ও শুধু-শুধু কষ্ট পাবে?

অনিল জিজ্ঞাসা করিল—কেন, গুপীকে তোমরা বেঁধে রেখেছ নাকি?

—হ্যাঁ। দেখেছিস্ দাদা, মাধোটা কেমন পাজী—ও ওদের বলেছে গুপীই দিনেরবেলা আমাদের নদীর পথ দেখিয়ে দিয়েছিল। তা' না হ'লে আমরা যেন আর বেরুতে পারতাম না! সেইজন্যে ওকেও ওরা দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। ওকে ফেলে আমাদের কি খাওয়া উচিত?

—কক্খনো না। ওরও বাঁধন খুলে দিতে হ'বে। দোষ ত' একলা আমাদেরই।

গণেশ কহিল—তা' কি হয়? তা' করতে গেলে ওদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যাবে যে।

বুলু ফন্দি বাহির করিল; বলিল—বেশ ত' বাঁধন এখন ওর নাই বা খুললে, কিন্তু লুকিয়ে কিছু খাবার ওকে দিয়ে এলে ক্ষতি কী? ও খেল কি না খেল, মাঝিরা ত' তা' আর টের পাচ্ছে না।

অনিল কহিল—হ্যাঁ, ওরা ত' আমাকে নামিয়ে দিয়ে ঐ দিকে কোথায় চলে' গেল—

বুলু তাড়াতাড়ি খাবারের থালা হইতে যত পারিল দুই হাত ভরিয়া তুলিয়া লইল—বাসি নিমকি আর গজা, টাটকা গোলাপজাম আর লিচু। বলিল—যদি দেখেই ফেলে, মারবে ত' আমাদেরই—তোমার সঙ্গে ঝগড়া হ'তে যাবে কেন? তুমি ত' আর ওর বাঁধন কেটে দিচ্ছ না। জলের গ্লাসটা নিয়ে তুই আয়, দাদা।

বাধা দিতে গণেশের হাত উঠিল না, শুধু কহিল—তোমাদের জন্যে কিছুই যে আর রইল না, বুলু।

বুলু ফিরিয়া দাঁড়াইল না, বলিল—না-ই থাক। আমাদের জন্যে যে কষ্ট করলে তাকে ত' আমাদেরই খেতে দেওয়া উচিত। আমরা ত' আর তেমন লোক নই যে, খাওয়ার লোভ দেখিয়ে ডাকাতের হাতে ধরিয়ে দেব!

সেই শিরিষ গাছের ডালের সঙ্গে গুপীকে তেমনি বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বুলু অনিলের কাঁধে চড়িয়া লম্বা হইয়া গেল এবং কোন রকমে গুপীর নাগাল পাইল যা-হোক। ফ্রকের কোঁচড় মেলিয়া কহিল—তুমি এই খাবার নাও,

গুপী। পরে আবার তোমাকে জলের গ্লাসটা তুলে দিচ্ছি। বাঁধনও তোমার শীগ্‌গির খুলে ফেলার ব্যবস্থা করব। ভয় নেই কিছু।

গুপী ছলছল চোখে বুলুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মেয়েটা যেন যাদুকরী, মিষ্টি কথায় সমস্ত নিষ্ঠুরতা শিথিল করিয়া আনিয়াছে।

বুলু আবার কহিল—তোমার কিছু ভয় নেই—ওরা কেউ দেখতে পাবে না। টপাটপ মুখে তুলে নাও—দাদার কাঁধে নিশ্চয়ই লাগছে। ওকেও ওরা তোমারি মত অমনি বেঁধে রেখেছিল—বেচারার সমস্ত গায়ে ব্যথা।

নীচ হইতে অনিল কহিল—ছাই ব্যথা, ও একদিনে সেরে যাবে। আমার মোটেও লাগছে না—তুমি আস্তে আস্তে খাও গুপী।

গুপী অতি কষ্টে হাতটা বাড়াইতে গেল, দড়ির বাঁধন একটুও আলগা হইল না—বুলুই অতি কষ্টে একটা-একটা করিয়া তাহার শীর্ণ প্রসারিত আঙুলের মধ্যে খাবারগুলি তুলিয়া দিতে লাগিল।

গুপীর চোখ বহিয়া টস-টস করিয়া জল গড়াইতেছে।

রাত্রে বুলুদের ঘরে সেদিন হরলাল আসিয়া শুইল—গণেশের আপত্তি টিকিল না। আর কথা বলে কাহার সাধ্য! যদি একটা কোথাও অস্পষ্ট শব্দ হইয়াছে, হরলাল অমনি তাড়িয়া উঠে। দুই ভাই-বোন অতি নিঃশব্দে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল।

আবার তাহারা কী করিয়া পলাইবে এই বিরাট অন্ধকারে তাহার কোথাও ফাঁক তাহাদের চোখে পড়িতেছে না। তাহারা কেবল ভাবিতেছে—কেন তাহারা সেই গাছের তলায় থামিল, থামিল ত' আবার আশ্রয় পাইবার লোভে অজানা লোকের সঙ্গ লইল কেন? তাহা না হইলে এতক্ষণে তাহারা বাড়ির বিছানায় আরাম করিয়া ঘুমাইতেছে—ঘরে তখন আর অমন বিকট একটা দৈত্য শুইয়া থাকিত না—শিয়রে মা বসিয়া থাকিতেন—তাহাদের মা!

আর একবার যদি তাহারা পলাইবার সুযোগ পায়, তবে কখনই আর থামিবে না—কিছুতেই না। পা ছিঁড়িয়া পড়ুক, মাথার উপরে অন্ধকার

আকাশে মেঘ ডাকুক, বৃষ্টিতে চক্ষু ঝাপসা হইয়া যাক্—তবু তাহারা ছুটিবে—শেষ পর্যন্ত ছুটিবে।

মা-কালী, তবু তোমাকেই ডাকিতেছি—পলাইবার জন্য আর একবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিবে না? ছেলেমানুষ একবার ভুল করিয়াছি বলিয়াই কি এমন করিয়া শাস্তি দিবে?

পরদিন বিকাল হইতেই সনাতন অনিলকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। হরলাল গণেশকে চুপি-চুপি ডাকিয়া বলিল—তোর কথামত সেই ব্যবস্থাই তা' হ'লে ঠিক করলাম। রাত করে' ছেলেটাকে বোনের বিছানা থেকে তুলে নিতে গেলে হয় ত' কান্নাকাটি করবে—আর বোনটিও যেমন আখখুটে, হয় ত' দাদারই সঙ্গে যাবার জন্যে গোঁ ধরে' বসবে। তাই নৌকোয় বেড়ানর ছুতো করে' ওকে আমরা এখুনি সরাচ্ছি। তুই ত' মেয়েটাকে অনায়াসে আগলাতে পারবি।

গণেশ কহিল—সে আর বলতে হ'বে না। কিন্তু আমাকে খবর পাঠাবি কখন তাহ'লে?

হরলাল বলিয়া চলিল—একেবারে এখন থেকেই নৌকোয় গা ঢাকা দিয়ে থাকব। রাত না পড়তেই অমাবস্যা লাগবে—তার পর চারদিক বেশ নিঝুম হ'য়ে এলে কালী-মন্দিরে নিয়ে যাব। আগে কিছুই ওকে জান্‌তে দিই নি। সনাতন সেই যে বলেছিল, মা-কালী এবার মেয়ে চান—সেটা ভুয়ো কথা। তোকে খেপাবার জন্যে।

গণেশ হাসিয়া কহিল—তা' আমি জানতাম। অমন মেয়ে কালীর খাবারের জন্যে তৈরি হয়নি।

হরলাল কহিল—কিন্তু ফৈজু মিয়াঁর জন্যে ত' হয়েছে। সে যাই হোক, তোড়জোড় সব হয়ে গেলে মাধোকে পাঠাব তোকে ডেকে আনবার জন্যে। কাপালিক ত' সন্ধ্যে থেকেই পূজোর আসবাব-পত্র নিয়ে হাজির থাকবে।

গণেশ কহিল—আর আসবাবই বা কী? মড়ার কয়েকটা খুলি, আর হাড়—আর পাঁচ-সাত পাত্তর তাড়ি!

—যাই হোক, মাধো এসে চুপি-চুপি ডাকলেই তুই বেরিয়ে পড়বি। তার

আগে মেয়েটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবি। গুপী আর মাধো দু'জনে পাহারা দেবে। টুঁ শব্দটি পর্যন্ত কানে যাবে না। তুই ঠিক সময়ে না এসে পৌছুলে কিন্তু কিছুই হ'বে না। কোপ ত' তোকেই বসাতে হ'বে—

গণেশ উদাসীন কণ্ঠে কহিল—আমি যে সর্দার। তোরা ত' খালি ভোগ করবার দলে। মাধোকে ঠিকঠাক পাঠিয়ে দিস তা' হ'লে? আমি বুলুকে ঠিক ঘুম পাড়িয়ে রাখব। গুপীকে তাড়া দেব'খন। এইবার একটুখানি এদিক-ওদিক করলে ওরই মাথা যাবে।

—নিশ্চয়। তবু কড়া না হ'লে কি চলে? তবে আমরা ওকে নিয়ে এগোই। মেয়েটাকে তুই ভুলিয়ে রাখ। গুপীকে আমি আগেই বলে রেখেছি। সব বন্দোবস্ত সারা হয়েছে। হরলাল দুই পা আগাইয়া আবার ফিরিল; কহিল—একটা আপদ ত' ভালয়-ভালয় বিদেয় হ'ল—এখন মেয়েটাকে গছাতে পারলেই নিশ্চিন্ত। তা' রতন সকালবেলা এসে খবর দিয়ে গেল যে, কাল রাতে ফৈজু আসছে। যা পাওয়া যায়—কী বলিস?

—নিশ্চয়। গণেশ সায় দিল। কথা একবার আগেই পাকা হইয়া গিয়াছে, এখন আর নড়চড় হইবে না।

বুলুকে কাছে রাখিবার আর মাত্র একটি দিন—চব্বিশটি ঘণ্টা মোটে হাতে আছে। তাহার পর বুলুও তাহার টগরের মত অকূল জনতার সমুদ্রে কোথায় হারাইয়া যাইবে—আর তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইবে না।

হরলাল কহিল—বলি দেবার লগ্ন কাপালিকই ঠিক করে' দেবে। অবশ্য তার অনেক আগেই মাধোকে পাঠিয়ে দেব। লগ্ন একবার ফসকালে কিন্তু বলি অশুদ্ধ হয়ে যায়—আর তাকে ছোঁয়া যাবে না—মনে আছে ত'?

গণেশ বিরক্ত হইয়া কহিল—তুই কাকে এ-সব শেখাচ্ছিস আজ? পাঁচটি বছর সমানে এমনি বলি দিয়ে আসছি—লগ্ন অমনি ফসকালেই হ'ল?

হরলাল বলিল—তবু একবার মনে করিয়ে দিলাম। বলিয়া সে হনহন করিয়া চলিতে লাগিল। সনাতন অনিলকে নিয়া তাহার জন্য নৌকায় অপেক্ষা করিতেছে।

ভাই বোন দু'টিকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করা হইল তাহা তাহারা ঘুণাক্ষরেও টের পাইল না। অনিল নৌকায় উঠিয়া ভাবিল কোন সুযোগে

পলাইবার পথ একটা হয় ত' পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে জানিতেও পারিল না, কী সর্বনাশ ঘনাইয়া আসিয়াছে।

অনিল জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে তোমরা ডাকাতদের দলে ভর্তি করে' নিলে নাকি?

সনাতন নৌকা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—কেন, পারবি নে?

—খুব পারব। নূতন আনন্দে অনিলের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এতক্ষণে তবে সে পথ দেখিতে পাইয়াছে। কোন না কোন ছুতায় মুক্তি তাহাদের মিলিবেই। এইভাবে দলে ভিড়িয়া এক সময় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সে বুলুকে নিয়া সরিয়া পড়িবে। কিছু সময় চাই মাত্র। সহ্য করিয়া থাকিতে হইবে বৈকি। ইহার মধ্যে পুলিশ আসিয়া উদ্ধার করিলে ত' ভালই, নতুবা সে-ই নিজের পথ খুঁজিয়া নিবে।

অনিল জিজ্ঞাসা করিল—আজকে কোথাও ডাকাতি করবে না?

সনাতন হুঁকা ধরাইতে-ধরাইতে কহিল—দেখা যাক।

কিন্তু সারা সন্ধ্যা ধরিয়া তাহারা নিরীহ ভাল মানুষের মত খালি নৌকাই টানিতে লাগিল। খাল ছাড়িয়া বড় নদীর ধারেও গেল না। দূরে কোন নৌকা যাইতে দেখিলেই অনিলের মন আনচান করিয়া উঠে—হয় ত' উহারা বাক্স-প্যাটরা সাজাইয়া বাড়ি চলিয়াছে। কোথায় না-জানি উহাদের ঘর! সামনে দিয়া গেলে অনিল উহাদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত। এখন ডাকিতে যাওয়া বৃথা—ডাকিতে গেলে জলের মধ্যে নির্ঘাৎ উহাকে ডুবাইয়া মারিবে।

অনিল অস্থির হইয়া বলিল—এখানে এমনি খালি ঘুরবে নাকি? বড় নদীতে যাবে না?

হরলাল ধমক দিল—কেন, এই বা মন্দ কী! বেশ ত' হাওয়া খাচ্ছিস।

মাধব নাক কুঁচকাইয়া টিপ্পনি কাটিল—ছোঁড়ার বাবুয়ানী ষোল আনা। বসতে পেলে শুতে চান একেবারে!

না, মন্দ কী! ভালই ত' সে বেড়াইতেছে। বুলুকে সঙ্গে আনিলে আরও ভাল লাগিত। আসিবার আগে তাকে জানান পর্যন্ত হইল না।

অনিলের প্রতি উহারা হঠাৎ এমন সদয় হইয়া উঠিল কেন বুঝা কঠিন। অথচ ইহারাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার উপর কী অত্যাচারই না করিয়াছে! এত অল্প সময়েই ইহাদের স্বভাবে এমন অদ্ভুত পরিবর্তন সম্ভব হইল কী করিয়া? সনাতন এমন সদাশয় যে, হাতের হুঁকা পর্যন্ত তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিতেছে—টানবি নাকি একটু? কোনদিন খাবার এমন সুযোগ পাবি কি না কে জানে!

কোন কথা না বলিয়া অনিল মুখ ফিরাইয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল—তবু দাদার ফিরিবার নাম নাই। বুলু অস্থির পায়ে কেবলই ঘর-বাহির করিতেছে। ব্যস্ত হইয়া গণেশকে আবার জিজ্ঞাসা করিল—দাদা কখন ফিরবে?

গণেশ কহিল—এই ফিরল বলে'। হাওয়া খেতে বেরিয়েছে কি না—

—হাওয়া খেতে বেরিয়েছে—আমিই বা এমন কী দোষ করলাম!

—চাই কি পথে দু'একটা শিকারও ত' মিলে যেতে পারে। তুমি গিয়ে কী করতে?

—বা, আমি থাকলে আগে থেকেই বলে দিতাম—এ নৌকোয় তোমরা উঠ না, এ ডাকাতে নৌকো, সব তোমাদের লুট্ করে' নেবে—

গণেশ হাসিয়া কহিল—সেই জন্যেই ত' তোমাকে নিয়ে যায় নি। ভালই করেছে না নিয়ে। বুলু তবু মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল—কিন্তু আমাকে ফেলে দাদা একলা গেল কী করে'?

গণেশ বলিল—ওকে জোর করে' ধরে' নিয়ে গেলে ও কী করতে পারে? ভয়ে বুলুর আকণ্ঠ শুকাইয়া গেল; কহিল—জোর করে' ধরে' নিয়ে গেছে? দাদাকে? কোথায়?

গণেশ কথাটাকে সামলাইল; কহিল—কোথায় আবার নিয়ে যাবে? হয় ত' ডাকাতি শেখাচ্ছে। তারপর দুই আঙুলে বুলুর কপালের উপর চুলের ঘুণ্ডরি তৈয়ারী করিতে করিতে কহিল—কে জানে—যেমন জাঁহাবাজ ছেলে তোমার দাদা—হয় ত' এক ফাঁকে কোথা দিয়ে পালিয়ে গেছে। তাই হয় ত' হবে—নইলে এতক্ষণ আর কি ওরা ফিরে আসত না? হয় ত' ওর খোঁজে সারা নদী-বন টহল দিয়ে ফিরছে।

তুবড়ির মত বুলুর সারা দেহে আনন্দের ফুলকি বিকীর্ণ হইতে লাগিল ঃ দীপ্ত কণ্ঠে কহিল—সত্যি বলছ, সর্দার—দাদা পালিয়েছে? বল, বল, তুমি কী করে' জানলে? বলিয়া বুলু দুই হাতে গণেশের হাত ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতে লাগিল।

গণেশ চোখ বুজিয়া কহিল—আমার মন বলছে, সে পালিয়ে গেছে, বুলু—দূরে, অনেক দূরে—কেউ তাকে আর ধরতে পারছে না।

—সত্যি? তুমি ঠিক জানতে, সে পালাবে? তুমিই তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছ বুঝি?

গণেশ বুলুকে সহসা বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—আমাকে দেখাতে হবে কেন? চালাক ছেলে, নিজেই ঠিক বার করে' নেবে, দেখ।

তাড়াতাড়ি বুলু গণেশের আলিঙ্গন হইতে আলগা হইয়া হাঁততালি দিয়া উঠিল; কহিল—খুব ভাল হবে, সর্দার। তুমি যেন ওকে ধরতে যেও না। বড় হয়ে ঠিক আমি তোমাকে—কী নেবে বল দিকি, আমার কাছ থেকে? ও! বাড়ি গেলে মা কত খুসি হবেন বল ত'—তুমি একবার ভাবতে পার?

পরে সহসা আবার মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল—কিন্তু আমাকে সঙ্গে করে' ও নিয়ে গেল না কেন? মা যখন জিজ্ঞেস করবেন, বুলু কোথায়, তখন ও কী বলবে? না, আমাকে না-নিয়ে গিয়ে ভালই করেছে—কী বল, সর্দার? আমি ওর মত অত ছুটতেও পারতাম না, লাফাতেও পারতাম না। আমি সঙ্গে থাকলে আমিই হ'তাম একটা বোঝা। মা-বাবা জিজ্ঞেস করলে ওর বলে' দিলেই চলবে—বুলু জলে ডুবে মরে' গেছে। আমার জন্যে কা'র বা কতটুকুন ভাবনা, বলিয়া ঝরঝর্ করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

গণেশ আবার তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—কান্না কিসের, বুলু? তুমি এবারে খেয়ে নাও—রাত ত' বেশ হ'ল, তারপর আমরা ঘুমুব।

দুই হাতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বুলু কহিল—আজ আমি খাব কী, সর্দার? দাদা পালিয়েছে, এই খবর পেয়েই ত' আমার পেট ভরে' গেছে। খাবার আর দরকার নেই।

—তবে শুয়ে পড়।

বুলু চুপ করিয়া তক্তপোষের উপর শুইয়া পড়িল। দাদা যেন সত্যই আর ফিরিয়া না আসে—দূরে বহুদূরে চলিয়া যায়—ঠিক তাহাদের কলকাতার বাড়িতে—সতের নম্বর বকুলবাগান ফার্ষ্ট লেনে। ভোর হইলে বাড়িতে কেমন উৎসব লাগিয়া যাইবে—আকাশের ঐ তারাটির মত চোখের উপরে সব স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। দাদারই ত' প্রথম বাঁচা দরকার—তাহাকে দিয়া পৃথিবীর কত কাজ হইবে, তাহার কত কীর্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লেখা থাকিবে, দিন-রাত্রির অনন্ত বন্যায়ও সে-অক্ষর ম্লান হইবে না। সে মেয়ে বলিয়া তাহাকে দিয়াও কোন কাজ হইত না এমন নয়, কিন্তু এখন সে-কথা ভাবিয়া মন সে কিছুতেই খারাপ করিবে না। আগে দাদা বাঁচুক—দাদার জন্য মরিতে তাহার দুঃখ নাই।

কি-একটা কাজে গণেশ বাহিরে যাইতেই বুলুও বাহিরে চলিয়া আসিল; কিন্তু দরজার ওপারে গুপী হুঁসিয়ার হইয়া কড়া পাহারা দিতেছে। আজ সে সহজে নড়িবে না।

গুপী কহিল—কোথায় যাচ্ছ খুকুমণি?

—কে, গুপী? কোথায় আবার যাব?—দাদা পালিয়েছে, জানো?

—পালিয়েছে? গুপী একেবারে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

—তুমি কিছু শোননি বুঝি? সেই সন্ধ্যের সময়—মাঝিরা ওকে ধরতেই পাচ্ছে না। কোথা দিয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেল—টিকিটিও কেউ দেখতে পেলে না! বেলাতেই বাড়ি পৌছবে।

গুপী জোর দিয়া কহিল—মিথ্যে কথা।

—তুমি বললেই ত' আর মিথ্যে হয়ে যাবে না। সর্দার নিজে আমাকে বলেছে। তুমি ত' তার চেয়ে বেশি জানো না।

ব্যাপারটা এতক্ষণে গুপীর আয়ত্ত হইল। বুঝিল, এই চঞ্চল মেয়েটিকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য গণেশ এই কৌশল করিয়াছে। তাই সে নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার জায়গায় গ্যাঁট হইয়া বসিয়া কহিল—পালিয়েছে ত' বেশ করেছে, তুমি এবার ঘুমোও গে, যাও।

বুলু কহিল—ঘুমুব কী! দাদা বন-নদী ভেঙে এখন ছুটছে, আর আমি

ঘুমুব! বেশ বলছ, দেখি। ভোরবেলার দিকে দাদার ট্রেন যখন প্রায় শেয়ালদা গিয়ে পৌছবে, তখনই যদি একটু ঘুম আসে। তখন ঘুমুতে আমাকে হ'বেই। কেননা দাদার সঙ্গে আমাকে দেখতে না পেয়ে মা'র সে-কান্না আমি দেখতে পারব না।

পরে ঘনিষ্ঠ হইয়া বুলু কহিল—আজকের রাতে তোমাদের সে-বলি ত' আর হ'ল না।

গুপী সাবধানে কহিল—হ'ল না মানে? হ'তেই হ'বে। বলি না হ'লে মা-কালী যে দল-কে-দল ধরিয়ে দেবেন।

—সেই তোমাদের বিশ্বাস নাকি? তা' মেয়ে যোগাড় হয়েছে?

—হয়েছে বৈ কি। না হ'লে চলবে কেন? যোগাড় একটা যে করে' হোক করতেই হ'বে।

—বেশ হ'বে তা' হ'লে। মাঝিদের ত' তা' হ'লে ফিরে আসতেই হ'বে—দাদার পেছনে আর ছোটা চলবে না। দাদা বেঁচে যাবে—আর সর্দারের কড়া হুকুমে আমার গায়ে ত' হাতই তুলতে পারবে না কেউ। ভালই হ'ল। তা' কখন বলি হ'বে?

—শীগ্‌গির। তুমি ঘুমিয়ে পড়, খুকি। বলির কান্না শুনতে নেই। ছেলেপিলেরা শুনলে তাদের অমঙ্গল হয়।

বুলু কান খাড়া রাখিয়া কহিল—এখান থেকে শোনা যায় নাকি? তোমাদের সেই মন্দির কত দূরে?

—এই ত' খানিকটা পথ। একটা ঝোপের মধ্যে।

—শুনলে কী অমঙ্গল হয়?

গুপী মুরুব্বিয়ানা করিয়া কহিল—ছেলেপিলেদের কেউ শুনলে তাদের আত্মীয়ের মধ্যে একজন মারা যায়।

—তবে কাজ নেই আমার শুনে। আমি শুয়ে পড়ি গে। ঐ যে সর্দার এসে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়লে কেউ যেন আমাকে জাগিয়ে দিও না, গুপী। ভাল হ'বে না তা' হ'লে। বলিয়া বুলু বিছানায় শুইয়া পড়িল।

গণেশ শিয়রে ঝুঁকিয়া তাহার কপালে একখানি হাত রাখিয়া প্রশ্ন করিল—ঘুম আসছে না, বুলু?

প্রাণপণে চক্ষু বুঁজিয়া রাখিয়া বুলু কহিল— এই আসছে। দাদাকে ওরা ধরতে পারেনি ত' সর্দার ?

গণেশের বুক ভেদ করিয়া শব্দ বাহির হইল—না।

এইবার নিশ্চিন্ত হইয়া বুলু ঘুমাইবে।

কিন্তু ঘুম আসিতেছে না। দাদার কথা ভাবিয়া নয়; কালীর মন্দিরে অসহায় কোন অনাথ শিশুর অন্তিম আর্তনাদ শুনিবার প্রতীক্ষায় সে কান খাড়া করিয়া রহিয়াছে।

অনেক রাত করিয়া নৌকা এক জায়গায় আসিয়া থামিল। সে জায়গাটা যেমন দুর্গম তেমনি অন্ধকার। বিস্তীর্ণ নির্জনতায় ভয় পাইয়া চারিদিকের গাছ-পালা ঝোপঝাড়গুলি পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আর রাশীভূত হইয়া উঠিয়াছে। পা ফেলিতে অনিলের স্নায়ু-শিরাগুলি কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল—মাধবকে জিজ্ঞাসা করিল—আমরা কোথায় যাচ্ছি ? বাড়ি যাবার এই কি রাস্তা নাকি ?

মাধব কহিল—বাড়ি যাব কোন্ দুঃখে ? যাচ্ছি মন্দিরে। আজকে মা'র কাছে সেই বলি দেবার দিন না ? বলিয়া সে চোখ টিপিয়া শয়তানি হাসি হাসিয়া কহিল—তুই কিছু জানিস্ না বুঝি ?

হরলাল বলিয়া উঠিল—না না, জেনে কাজ নেই। চল হে অনিলবাবু।

বলির কথা শুনিয়া অনিলের সর্বাঙ্গ অসাড় হইয়া আসিল। শুক্‌না গলায় কহিল—বলির মেয়ে ত' কই ধ'রে আনলে না ?

সনাতন তাহার পিঠে এক ধাক্কা মারিয়া কহিল—সেজন্যে তোর মাথা ঘামাতে হ'বে না। যা, এগো।

তবে উহারা বুলুকেই বলির জন্য ধরিয়া আনিবে নাকি। সর্দার কি তাহাতে বাধা দিবে না একটুও ? আর সেই বলি অনিলকে চোখ মেলিয়া দেখিতে হইবে। একবার বেলতলা রোডের বারোয়ারি দুর্গা পূজায় সে পাঁঠা-বলি দেখিয়াছিল। মনে-মনে সে-কথা ভাবিয়া এখনও তাহার হৃৎকম্প শুরু হয়—তাহার পর কত রাত্রি তাহার দুঃস্বপ্নে কাটিয়াছে। সেই পাঁঠাটার মতই বুলু কাঠগড়ায় গলা পাতিয়া বিকৃত স্বরে প্রাণপণে চীৎকার

করিবে—আর অনিল তাহার দাদা হইয়া একটা আঙুলও তুলিতে পারিবে না।

গাছ পাতায় নিবিড় করিয়া ঘেরা ছোট্ট একটি ভাঙা মন্দিরের কাছে আসিয়া সকলে থামিল। এইখানে সমস্ত আকাশ রুদ্ধ হইয়া আছে—বাহিরে যে প্রকাণ্ড পৃথিবী নদ-নদী মাঠ-পর্বত বেষ্টন করিয়া চারিদিকে প্রসারিত হইয়া আছে, এ-কথা ধারণাই করা যায় না। মন্দিরের সামনে কাপালিক আগে হইতেই বসিয়া আছে—সেই আজ রাত্রে পূজা করিবে। কাপালিকের বিশাল চেহারা, মাথায় স্তূপীকৃত দীর্ঘ জটা, সারা গায়ে ভস্ম মাখা—চক্ষু দুইটি যেন আগুনের ডেলার মত গন্ গন্ করিতেছে। সকলকে দেখিতে পাইয়া কাপালিক কহিল—এলি এতক্ষণে? গণেশ কৈ?

হরলাল আগাইয়া আসিয়া কহিল—ওকে এখনি খবর পাঠাচ্ছি। পুজোর আয়োজন সব ঠিক করে' ফেলি আগে। পরে অনিলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—এই ছোঁড়া, প্রণাম কর এঁকে।

ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অনিল কাপালিকের পায়ের কাছে নত হইল। লোলুপ চক্ষু দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ লেহন করিতে করিতে কাপালিক কহিল—বাঃ। বেশ নধর ছেলেটি ত'। দেখে খুসি হওয়া গেল।

মন্দিরের গায়ে দড়ি বাঁধা একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছে—তাহারই আলোতে অনিল পাষাণময়ী কালীকে দেখিল। রক্তপিপাসু জিহ্বা আগুনের শিখার মত লক্‌লক্ করিতেছে। সামনেই প্রকাণ্ড খড়্গ—তাহাতে আবার চক্ষু আঁকা। কাপালিক সিন্দুর দিয়া সেই খড়্গ চিত্রিত করিতে বসিল।

অনিল চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, বুলুকে দেখা গেল না। অথচ অন্য কোন বলিও এখন পর্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। না হউক, সে আগাইয়া আসিয়া মন্দিরের সামনে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে কহিল—বুলুকে তুমি ভাল রাখ, সে যেন আর কষ্ট পায় না।

কাপালিক হাসিয়া কহিল—ছেলেটার দেখছি, ভারি ভক্তি।

সনাতন তাহার কানে কানে কহিল—এখনও জানতে দিই নি। নইলে এখন থেকেই চেঁচাতে শুরু করবে।

কাপালিক কহিল—হ্যাঁ, অজ্ঞানেই ত' বেশি আনন্দ। বলিয়া সে মড়ার খুলিতে ঠোক্কর দিতে-দিতে কি সব দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াইতে লাগিল।

অনিল মাধবকে ফের জিজ্ঞাসা করিল—এখনও তোমাদের বলির মেয়ে এল না, কখন আসবে?

সনাতন কহিল—এই আসছে। যা ত' মাধো, গণেশকে গিয়ে চুপিচুপি খবর দে। তুই কিন্তু ওখানে থাকিস, মেয়েটাকে পাহারা দিবি, যা।

মাধব অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তবে গণেশই বুলুকে লইয়া আসিবে নাকি? অথচ মেয়েটাকে পাহারা দিবার জন্য মাধবকে ঐ দিকে মোতায়েন রাখা হইল। বুলুকে ছাড়া পাহারা দিবার মত আর মেয়ে কোথায় এখানে? কিন্তু বলির জন্য মেয়েই বা কখন ধরিয়া আনিবে? অনিল বিমূঢ় চোখে ইহাদের কাণ্ড দেখিতে লাগিল।

কি-সব যাগ-যজ্ঞ শুরু হইয়াছে, মড়ার খুলিতে করিয়া কি সব তরল পানীয় খাইয়া ইহাদের চোখ-মুখ ক্ষিপ্ত, বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। উগ্র গন্ধে অনিলের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। এখনও ত' অভিনয়ের শেষ দৃশ্য বাকি আছে। এক আশ্রয়চ্যুত দুর্বল শিশুর মুণ্ডুটা খাঁড়ার এক কোপে শরীর হইতে কেমন করিয়া আলাদা হইয়া আসিবে তাহা তাহার চোখ মেলিয়া দেখিতে হইবে! পৃথিবীতে কোথাও এতটুকু ঝড় উঠিবে না।

গণেশ আসিয়া পৌছিল—তাহার হাত শূন্য। বুলুকে তাহা হইলে আনে নাই—সর্দার সত্যই খুব ভাল লোক—বুলুর উপর তার অগাধ মায়া!

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল—মেয়েটা কী করছে?

গণেশ কহিল—ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। সব তৈরি ত'? বেশ! পুজোর আর বাকী কত?

অনিল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। বুলু তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে যে এই বীভৎস দৃশ্য দেখাইতে উহারা তুলিয়া আনে নাই, এজন্য মনে-মনে সে খুসি হইল। সে নিজেই বা এই দৃশ্য সহিতে পারিবে নাকি? সেই দুর্গা পূজার দিনে পাঁঠার সেই করুণ আর্তধ্বনি এখনও তাহার মনের মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে। কিন্তু বলি কোথায়? হয় ত' কাপালিকের ঝুলির মধ্যে কোন সদ্যোজাত শিশুকে মুড়িয়া রাখা হইয়াছে—এখনি দেখা যাইবে।

বুলু একলা ঘুমাইতেছে—রক্ষী মাত্র গুপী আর মাধব। গুপীই বা কোন্ ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে নাই! অনিল সঙ্গে থাকিলে আবার তাহারা পলাইয়া যাইত—আর এবার দৌড়িতে আরম্ভ করিলে কখনই তাহারা থামিত না। কাল কী ভুলটাই যে হইয়া গিয়াছিল!

কাপালিক হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল—পূজো শেষ। এবারে ধরে' নিয়ে আয়। খাঁড়াটাও আমি উৎসর্গ করে' দিয়েছি। ওকে চান করাবি না?

কাহাকে যে উহারা কাপালিকের কাছে ধরিয়া নিয়া যাইবে অনিল চট্ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হতভম্বের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিল। গণেশ কহিল—চান করাবার সময় নেই। গোলমাল বাধ্‌তে পারে। বলিয়া সে হরলালকে ইসারা করিল।

হরলাল সহসা অনিলের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল—চলে এস বাছাধন। তোমার ত' একটা গতি করি, বোন্‌টার কাল ব্যবস্থা করা যাবে।

গণেশ দুই হাতে প্রকাণ্ড খড়্গটা উত্তোলন করিয়াছে, কোমরে তাহার গামছা বাঁধা। প্রবল কণ্ঠে সে গর্জন করিয়া উঠিল—পা দুটো ধরে' তুলে আন্ সনাতন! শীগ্‌গির।

কাপালিক চক্ষু মুদিয়া বজ্রস্বরে হাঁকিয়া উঠিল—জয় মা, ভৈরবী!

সনাতনকে সাহায্য করিতে হইল না, হরলাল একাই অনিলকে টানিয়া আনিতে পারিয়াছে; অনিলের বুঝিতে আর কিছু বাকী নাই, কিন্তু সত্যই যে সে কি বুঝিল—তাহা কে বলিবে! তাহার চোখের উপরে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া নিরেট পাহাড় হইয়া গেল, বাতাসের চলাচল বন্ধ হইয়া গেল—ছোটার বেগে কোন একটা গ্রহের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া কাঁচের বাসনের মত পৃথিবীটা নিমিষে যেন টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া গেল। অন্ধকার আকাশ বিদীর্ণ করিয়া অনিল চীৎকার করিয়া উঠিল—মাগো! বুলুরে—

সেই চীৎকার শুনিয়া কাপালিক অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

গণেশ পুনরায় গর্জন করিয়া উঠিল—ঘাড় মুচ্‌ড়ে দে না ওটার!

অনিলের মুখ দিয়া আবার একটা ভয়বিহ্বল অসহায় আর্তনাদ বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু গলার উপরে হরলালের দশটা আঙুলের দৃঢ় প্রাণান্তকর চাপে সেই স্বর অর্ধপথে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। অনিলের কোন কথা আর

মনে রহিল না—মা'র মুখ, বুলুর চক্ষু দুইটী, বাবার কথা, ঘর বাড়ি ইস্কুল, রাস্তা ট্রাম মোটর, মনুমেণ্ট মিউজিয়ম সব তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া বায়স্কোপের ফিতার মত ঘুরিয়া চলিল। বুলুকে আর একবার দেখিয়া আসা হইল না, এ-কথা শুনিলে মা আর বাঁচিবেন না। তবুও মনে-মনে সে একবার বলিল—আমাকে ত' নিলে, কিন্তু হে মা কালী, বুলুকে তুমি দয়া কর। ওকে মা'র কোলে ফিরিয়ে দিয়ে এস।

গণেশ শূন্যে খড়্গটা দুইবার নাচাইয়া ক্ষিপ্তের মত চেঁচাইয়া উঠিল—শীগ্‌গির কর হরলাল—শীগ্‌গিরি!

হাত তুলিয়া কাপালিক নির্মম কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—জয় মা, কালিকে—জয় মা!

গণেশ কখন শিয়র হইতে উঠিয়া গেল বুলু ঠিক টের পাইয়াছে। কিন্তু জাগিবার এতটুকু লক্ষণ সে দেখাইল না। সর্দার এত রাতে কোথায় যায়! দরজাটা প্রায় খোলাই রহিল। যাইবার সময় গুপীকে সে বলিয়া গেল—আমি খানিক বাদেই আসছি—কাজটা সেরে। হুঁসিয়ার থাকিস্ গুপী!

গুপী ঘুম-জড়ান চোখে বলিল—হুঁ!

গণেশ আবার কহিল—বুলু অবিশ্যি ঘুমোচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা মেয়ে—ওর দাদার মত নয়। ওর জন্যে ভয় করি না। তবু চোখ রাখিস। কিছু একটা হ'লে ওদের কাছে মুখ দেখাতে পারব না। তুইও এখানে থাক্, মাধো। বলিয়া গণেশ পায়ে-পায়ে লতা-পাতার শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

যাক্, আরও দূরে যাক্! বুলু মুচকিয়া হাসিল—সে ঠাণ্ডা মেয়ে বৈ কি, এখন ত' তার ঘুমাইবার কথা!

মাধব গুপীর গায়ে ঠেলা দিয়া কহিল—ঐ ত' এক-রত্তি পুঁচ্‌কে মেয়ে—তুই একা সামলাতে পারবি নে? ঘুমে জড়াইয়া জড়াইয়া গুপী কহিল—খুব পারব!

—আমি তবে বলিটা একটু লুকিয়ে দেখে আসি, কেমন? নতুন ধরনের বলি কি না—বুঝলি নে? কাউকে বলে' দিস নে যেন!

—না, যা তুই। মাধব তখুনি অন্য পথে মন্দিরের দিকে ছুট দিল।

বলি! নতুন ধরনের বলি! বুলু বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। হোক গে বলি, বুলুর তাহাতে কণামাত্র কৌতূহল নাই; এক-রত্তি পুঁচকে মেয়েকে গুপী একা সাম্‌লাইবে বৈ কি! সে এইবার আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িবে।

মাধবও চলিয়া গিয়াছে। সারা সকাল প্রহার ও পীড়ন সহিয়া গুপী ক্লান্তিতে এখন নিশ্চয়ই ঝিমাইতেছে—ঘুমে তাহার স্বর আড়ষ্ট! দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলে সে টেরও পাইবে না।

আর টের যদি পায়ও, বুলুর বড় আশা হইল, গুপী নিশ্চয়ই তাহাকে পলাইয়া যাইতে বাধা দিবে না। সকালবেলা দাদার কাঁধে চড়িয়া সে নিজে উহাকে খাবার খাওয়াইয়াছে। সে কথা কি সে এই কয়-ঘণ্টায় ভুলিয়া যাইবে? তাহাকে দাদার পিছে-পিছে মা'র কাছে ফিরিয়া যাইতে দিবে না?

জুতা জোড়া পরিয়া নিবে নাকি? দরকার নাই, ফুটুক কাঁটা, বুলু কিছুতেই আর পেছপা হইবে না। জুতা পায়ে থাকিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিতে পারিবে না, তাহা ছাড়া জুতা পরিবার সময়ই বা এখন কোথায়? খুঁজিয়া নিতেও ত' দেরি হইয়া যাইবে। থাক্, বুলু পা টিপিয়া দরজার সামনে আসিল। মেয়ে বলিয়া দাদা যেন আর তাহাকে ঠাট্টা করিতে না আসে? দাদার চেয়ে সে কিসে কম!

আস্তে আস্তে দরজাটা সে খুলিল—ঠিক, বেড়ার গায়ে হেলান দিয়া বসিয়া গুপীচন্দ্র পা ছড়াইয়া ঘুম যাইতেছেন!

ঘুমাও গুপী, তোমাকে আমি বিরক্ত করিব না।

দরজার বাহিরে বুলু সবে এক পা বাড়াইয়াছে, অমনি রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দূর হইতে একটা করুণ চীৎকার বুলুর বুকে আসিয়া বিদ্ধ হইল। দূর হইতে কে যেন তাহাকে ডাকিল—বুলুকে ডাকিল—হ্যাঁ, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল! সেই ডাক গাছ-পালায় বনে-বনান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া বারে-বারে তাহাকে ডাকিতে লাগিল—বড় বিপদে পড়িয়াছি বুলু, আর বুঝি তোকে দেখতে পেলাম না!

চীৎকার শুনিয়া গুপীও ধড়মড় করিয়া উঠিল। বুলু ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিল—ও কে কাঁদে, গুপী!

গুপী উঠিয়া বসিল না, নির্লিপ্তের মত কহিল—কে আবার! সেই বলি হচ্ছে না আজ। তার কান্না।

—বলি হচ্ছে? সুঁচের মত তীক্ষ্ণ একটা কাঁপুনি বুলুর পা হইতে মাথা পর্যন্ত ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেল। প্রায় কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিল—কিন্তু দাদা কাঁদছে যে! ঠিক দাদার গলা! দাদাকেই ওরা বলি দিচ্ছে নাকি তবে?

গুপী কহিল—তা' কী করা যাবে!

—কী করা যাবে! বুলু ঘরের মধ্যে পাগলের মত দুই হাতে চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ফাঁকি দিয়া দাদাকে উহারা কালী-মন্দিরে বলি দিতে নিয়া গিয়াছে! সে দাদার ছোট বোন হইয়া ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিবে না?

সময় নাই, সময় নাই—যাহা করিবার এখনই করিয়া ফেলিতে হইবে! কিন্তু কি করা যায়!

বিদ্যুৎ-বিকাশের মত বুলুর মাথায় কি-একটা চমক দিয়া উঠিল। তাই! তাড়াতাড়ি বুলু কুলুঙ্গি হইতে কেরোসিনের কুপিটা টানিয়া আনিয়া বিছানাময় ছড়াইয়া দিল, ক্ষিপ্রহাতে বিছানার চারিধারে আর সব জিনিস-পত্র কাপড়-জামা খড়-কুটা কাঠ-কাগজ যাহা যেখানে পাইল সব জড়ো করিয়া লইল। কাল তামাক খাইবার জন্য টিকে ধরাইয়া হরলাল দিয়াশলাইটা কোথায় রাখিয়াছিল তাহা সে আগেই জানিত। সেই দিয়াশলাইটা খুঁটির পিছনে বেড়ার গায়ে তেমনি আটকান আছে। ভগবান, যেন উহাতে কাঠি থাকে! একটু দয়া করিলে এতবড় সৃষ্টিতে তোমার কিছু ক্ষতি হইবে না।

কাঠি আছে, কাঠি আছে। বুলু ফস্ করিয়া কাঠি ধরাইল। আগুনের ক্ষণিক শিখায় বুলুর সে মুখ কেমন রুক্ষ, কাতর, অসহিষ্ণু দেখা গেল। কেরোসিন তেলে ভিজান রাশীকৃত বিছানার উপর কাঠিটা ফেলিয়া দিয়া বুলু নিমিষে ঘরের বাহির হইয়া আসিল।

প্রথমে খুব-খানিকটা ঘন-কালো ধোঁয়া তার পরে আগুন। সেই আগুনের উৎসবে অমাবস্যা রাত্রি আলোর আনন্দে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

পোড়ার গন্ধ পাইয়া গুপী তন্দ্রা ভুলিয়া লাফাইয়া উঠিল। ঘরের চেহারা

দেখিয়া সে একেবারে স্তব্ধ হতবাক্ হইয়া গেল। কী যে এখন করা যায় চট্ করিয়া কিছুই সে ভাবিয়া পাইল না। চীৎকার করিয়া উঠিল—বুলু!

—এই যে। সামনে দাঁড়াইয়া বুলু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেই লেলিহান আগুনের নৃত্য দেখিতেছে।

হাওয়া ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে—দগ্ধ জিনিসের টুকরা ছড়াইয়া পড়িয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, আগুনের উদ্ধত শিখায় সামনে তারাগুলি চক্ষু মেলিয়া চাহিতে পারিতেছে না। শিশুর প্রতিহিংসার এই উদ্দাম রূপ দেখিয়া গুপীর সমস্ত শরীর অসাড় হইয়া আসিল, কহিল—এ কী করলি, খুকি?

বুলু মাটিতে লাথি মারিয়া কহিল—বেশ করেছি, একশ বার করব। আমার দাদাকে ওরা মেরে ফেলেছে না? আমাকেও এইবার মারুক। দাদাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। বলিয়া বুলু ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রুদ্ধবাক মৃতপ্রায় অনিলের ঘাড বাড়াইয়া গণেশ প্রায় কোপ্ বসাইবে কাপালিক অমনি শূন্যে হাত তুলিয়া গলা ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—আগুন, আগুন।

দক্ষিণের আকাশটা সমুদ্রের জলে সূর্যাস্তের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। গণেশদেরই বাড়ি-ঘর সব পুড়িতেছে নিশ্চয়—ওদিকে বনের শেষে আর কাহারও বাড়ি নাই। গণেশের হাতের খাঁড়া শিথিল হইয়া আসিল; কহিল—আমাদেরই বাড়ি নাকি রে, হরলাল?

হরলাল গাছের ফাঁকে উঁকি দিয়া কহিল—তাই ত' মনে হচ্ছে।

—বলিস্ কি? শীগ্‌গির ছুটে চল্—ঐ ঘরে যে বুলু শুয়ে আছে। বলিয়া হাতের খড়্গ মাটিতে ফেলিয়া দিয়া গণেশ দ্রুত অগ্রসর হইল।

সনাতন চেঁচাইয়া উঠিল—কিন্তু কালী পুজোর বলি?

আর কালী পুজো! আগুনের শিখায় রক্তলিপ্ত লেলিহান রসনা দিকে-দিকে প্রসারিত করিয়া উন্মাদিনী কালী আকাশে নৃত্য করিতেছেন। সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার দণ্ড নিষ্ঠুর নিদারুণ রূপে দেখা দিয়াছে। ভয়ে ও ভক্তিতে অভিভূত হইয়া গণেশ বন-বাদাড় ভেদ করিয়া ছুটিতে লাগিল।

হরলাল চেঁচাইয়া বলিল—হ্যাঁ রে, আমাদেরই বাড়ি। গেল, সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল—তোরা এগো শীগ্‌গির।

বুলু—বুলু আগুন লাগিবার আগে বাহির হইতে পারিয়াছে ত'?

সেই আগুন যেন গণেশের বুকের মধ্যে জিহ্বা বিস্তার করিয়া দিয়াছে।

হরলালও আর দ্বিধা করিল না, বেগে ছুটিয়া চলিল; কহিল ছোঁড়াটাকে তুলে নিয়ে চল। আর কেন?

সনাতন প্রশ্ন করিল—কেন, বলি হ'বে না তবে?

কাপালিক উত্তর দিল—হাতের খাঁড়া যখন মাটিতে একবার খসে পড়ল তখন আর বলি কিসের? কোথায় যেন ভীষণ ত্রুটি হয়ে গেছে হরলাল, দেবীর মুখ আজ প্রসন্ন নয়। দেখ, দেখ, ঐ চেয়ে দেখ, মা'র হাতের খড়্গ কেঁপে উঠছে। পরিণামে কোথায় একটা প্রলয় উঠবে ঠিক। জয় মা, কাত্যায়নী!

সনাতন ধীরে-ধীরে অনিলকে কাঠগড়া হইতে মুক্ত করিয়া লইল। তাহার নাক মুখ দিয়া টপটপ করিয়া রক্ত গড়াইতেছে—সেই রক্ত দেখিয়া ভয়ে সনাতন দুই পা পিছাইয়া আসিল, তাহাকে স্পর্শ করিতে আর হাত উঠিল না তাহার। মনে হইল, কালী যেন সেই রক্তের অন্তরালে জিহ্বা মেলিয়া সনাতনের দিকে চাহিয়া আছেন।

সহসা কাপালিক হুঙ্কার দিয়া উঠিল—ঐ দেখ, কালী আকাশের বুক চিরে রক্ত খাচ্ছেন। এই না হ'লে মা অশিবনাশিনী! বলিয়া সে তাহার জিনিস-পত্র ঝোলা-ঝুলিতে লইয়া গভীরতর বনের উদ্দেশে পাড়ি দিল।

সনাতন বিস্ময়াবিভূত কণ্ঠে অনিলকে কহিল—আর দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? তোর ত' আয়ুর বেজায় জোর দেখছি; খাঁড়ার তলায় শুয়ে বেঁচে উঠলি। কিন্তু আগুনে ওদিকে তোর বোন যে পুড়ে মরল। যাবি না ওদিকে? না, হাঁ করে' দাঁড়িয়ে থাকবি?

অনিলের এতক্ষণে একটু হুঁস হইল। সে বাঁচিয়া আছে না মরিয়া গেছে তাহাই সে ঠিক ঠাহর করিতে পারিতেছিল না। বুলু—হ্যাঁ, নামটা তাহার চেনা লাগিতেছে বটে! আকাশটা ঐ ত' টক্‌টকে লাল হইয়া উঠিয়াছে। পায়ের নীচে কী ওটা পড়িয়া আছে? খাঁড়া? অনিল শিহরিয়া উঠিয়া ঘাড়ের

উপরে হাত রাখিল, দুই হাতে মাথাটা ধরিয়া প্রবল ঝাঁকুনি মারিল—না, মাথা অটুট আছে। নাকের নীচে হাত পাতিয়া স্পষ্ট সে অনুভব করিল, সে বেশ নিশ্বাস নিতেছে।

অল্পে-অল্পে সে এখন চারিদিককার অবস্থাটা আয়ত্ত করিতে পারিল। এতক্ষণ সে মৃতের রাজ্যে—চিরস্তব্ধতার দেশের প্রায় সীমান্তে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রাখিতে যাইবে অমনি কে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া নীচে—মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছে!

হ্যাঁ, বুলু, বুলুর কী হইয়াছে বলিলে? অনিল এইবার ঠিক বুঝিতে পারিবে, তাহার মনে হইল।

তাহাকে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সনাতন ফের কহিল,—তোর বোন যে পুড়ে' মরল! এদিকে বোনের জন্যে ত' কত কান্না!

—পুড়ে মরে' গেছে? বুলু? অনিল আর একবার কালী-মন্দিরের কাছে ধুপ্ করিয়া মাথা ঠেকাইয়া কহিল—আমারই মত বুলুকে বাঁচিয়ে দাও। বলিয়া সে তীরের মত ছুটিয়া চলিল। সনাতন তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া পারিয়া উঠিতেছে না। জীবন ফিরিয়া পাইয়া ছেলেটা যেন কয়েক মুহূর্তেই পক্ষীরাজ ঘোড়া হইয়া উঠিয়াছে।

সকলের আগে গণেশই প্রথম উপস্থিত হইল। আগুনের অবস্থা দেখিয়া গণেশের প্রাণে আর জল নাই—সব ঘর কয়খানাই ধরিয়া গিয়াছে। কাল ভোরে সেই সব ঘর-দুয়ারের কিছুমাত্র চিহ্ন থাকিবে না—খালি কয়েক মুঠা ছাই হাওয়ায় উড়িয়া যাইবে।

উঠানে আসিয়াই গণেশ ডাক দিল—বুলু!

পাশে একটা গাছের তলা হইতে বুলু নির্ভয় কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—এই ত' আমি—এই দিকে।

স্বর অনুসরণ করিয়া গণেশ গাছের তলায় গিয়া দেখিল, একটা শক্ত লতা দিয়া গুপী বুলুকে নির্মমভাবে বাঁধিতেছে।

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল—কেন, আগুন লাগল কিসে?

গুপী উত্তেজিত হইয়া কহিল—ওই ত' লাগিয়েছে।

—লাগিয়েইছি ত'। একশ বার লাগাব। কেন তোমরা দাদাকে কেটে ফেললে? তার বদলে আমি তোমাদের ঘরে আগুন লাগাব না!

পাষাণকায়া কালীর চক্ষের মতই বুলুর দুই চোখ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গণেশের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

গণেশ হুকুম করিল—শীগ্‌গির খুলে ফেল্ বলছি, ওর বাঁধন!

বাঁধন খুলিতে-খুলিতে গুপী আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিল—যদি আবার পালিয়ে যায়, সেইজন্যে বেঁধে রেখেছি।

বুলু মুখ-ঝামটা দিয়া উঠিল—তা' বাঁধবেই ত'! দাদার কাঁধে চড়ে' তোমাকে খাবার খাইয়ে দিইনি? না বাঁধলে সে-উপকার শোধ করবে কী করে'? পাহারা দেবার নাম করে' বাইরে বসে' ঝিমোও, আর ঘরের মধ্যে যাকে কয়েদ করে' রেখেছ সে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় —আমাকেই ত' বাঁধবে? গায়ের জোরে তোমার সঙ্গে পারি না কি না?

তারপর বাঁধন থেকে ছাড়া পাইয়া বুলু হঠাৎ গণেশের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল—সত্যি কথা বল্‌লাম বলে' আমাকে খুব শাস্তি দেবে, সর্দার? দাদার মত দা দিয়ে কেটে ফেলবে আমাকে? তা' ফেল। দাদাকে ছেড়ে বাঁচতে আমার ইচ্ছা করে না।

গণেশ কোন উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর হঠাৎ তাহার কঠিন হৃদয়ে যেন মমতার বান ডাকিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি বুলুকে সে কোলে তুলিয়া লইয়া অগাধ স্নেহে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিল—শাস্তিই তোমাকে দেব বৈ কি।

গণেশের এই স্নেহস্বরের গভীর অর্থ বুলু চট করিয়া বুঝিতে পারিল না, কহিল—তা' যা' খুসি তোমার শাস্তি দাও। কিন্তু তুমি যদি দাদার ছোট বোন হ'তে, আর তোমার দাদাকে যদি ডাকাতরা কেটে ফেলত সর্দার, তা' হ'লে তুমি কী করতে, বল দিকি? কিছুই কী তুমি করতে না? দাও, আমাকে কোল থেকে নামিয়ে দাও, দাদার মত আমাকেও কেটে ফেল।

গণেশ বুলুকে বুকের উপর নিবিড়তর মমতায় আঁকড়াইয়া ধরিল। সে শাস্তি না দিক্, কিন্তু আগুন লাগিবার কারণটা একবার জানিলে হরলাল

উহাকে আস্ত রাখিবে না। সেই ব্যবহারটাই ত' হরলালের চরিত্রে অতি-মাত্রায় সঙ্গত হইবে। তাহাকে গণেশ কী বলিয়া বাধা দিবে? কী বলিয়া তখন বুলুকে বাঁচান যাইবে? যে-মেয়ে ঘর-বাড়ি ধন-সম্পত্তি সমস্ত আগুন ধরাইয়া ছাই করিয়া দিল, তাহাব জন্য কোন্ মুখে সে দয়া চাহিবে? দয়া চাহিলেই বা তা' শুনিবে কে, আর শুনিবেই বা কেন?

ঐ ত' হরলাল আসিয়া পড়িল—আগুন দেখিয়া আশেপাশের দলের গুপ্তচররা সব ক্রমে ক্রমে আগাইয়া আসিতেছে। তাহাদের সমবেত আক্রমণ হইতে সে একা বুলুকে কী করিয়া রক্ষা করিবে? সে ছাড়া এই সর্বনাশের সময়ে বুলুর আর কে আছে।

ঐ—ঐ—পদধ্বনিগুলি কাছে আসিয়া পড়িল! তাহার পর কাল ফৈজু আসিবে—উহার কাছে বুলুকে বেচিয়া দিবার কথা পাকা হইয়া গিয়াছে। এখন বুলুকে নিয়া পলাইতে না পারিলে আর উপায় নাই।

গণেশ মুহূর্তে মরিয়া হইয়া উঠিল। ইতস্তত না তাকাইয়া সে বুলুকে কোলে লইয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। গুপী হ্যাঁ-না একটা শব্দও উচ্চারণ করিতে পারিল না।

বুলু আশ্চর্য হইয়া গেল; করুণ করিয়া কহিল—এইখানে আমাকে মারবে বুঝি, সর্দার?

ততোধিক স্নেহে বুকের সঙ্গে বুলুকে সাপটাইয়া ধরিয়া গণেশ কহিল—মারব না, তোমাকে মারব না, বুলু। কোন ভয় নেই। বেশ করে' গলাটা আমার জড়িয়ে ধর।

বুলু কহিল—আমাকে তবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

—দূরে, অনেক দূরে—কলকাতায়, তোমার বাড়িতে। বাড়ি যাবে না?

—বাড়ি? আমাকে তুমি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ। বল কী, সর্দার?

—হ্যাঁ, বাড়িই নিয়ে যাচ্ছি। ঠিকানা তোমার মনে আছে ত'?

—ঠিকানা মনে নেই? আমাকে তুমি কী ভাব, শুনি? সতের নম্বর বকুলবাগান ফার্স্ট লেন। কিন্তু দাদা? দাদাকে ছাড়া বাড়ি আমি কী করে' যাব, সর্দার? বলিতে বলিতে গণেশের কাঁধের উপর বুলুর চোখের জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

চলিতে-চলিতে গণেশ কহিল—দাদাও তোমার বাড়ি ফিরবে বৈ কি।

—দাদা বাড়ি ফিরবে? বুলু গা-টা টান করিয়া গণেশের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—সে কেমন, সর্দার? মরা লোক আবার ফিরে আসে?

—দাদা ত' তোমার মরেনি, বুলু। কালী যখন তাকে এবার বাঁচিয়েছেন, তখন আর তাকে ঠেকায় কে। বাড়ি একদিন ফিরবে বৈ কি সে।

সর্দার এই সব কী আজগুবী কথা কহিতেছে! তাহার বাড়ি-ফেরা না-হয় বিশ্বাস করিল, কিন্তু মানুষ মরিয়া যাইবার পর কালীর আশীর্বাদে বাঁচিয়া উঠিতে পারিলে আর কথা ছিল না। তবু এমন কথা শুনিয়া বিরুদ্ধ যুক্তি সত্ত্বেও সে খুসি হইয়া উঠিল; কহিল—দাদা বেঁচে আছে? তবে ওকেও সঙ্গে করে' নিয়ে চল। নিয়ে যেতেই হ'বে ওকে। আমি একা ফিরে গেলে বাবা-মা যখন দাদার কথা জিজ্ঞেস করবেন, তখন আমি কী বলব? দাদাকে না নিলে আমি কক্‌খনও যাব না তোমার সঙ্গে। দাদা বেঁচে আছে। সত্যি বল্‌ছ ত'?

গণেশ এই এক নতুন মুস্কিলে পড়িল। দাদা যখন বাঁচিয়াই আছে তখন উহাকে সঙ্গে লইতেই হইবে—বুলু দস্তুরমত হাত পা ছুঁড়িয়া গণেশের চুল টানিয়া নাক-মুখ খিমচাইয়া চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিল। কিছুতেই মেয়েটা প্রবোধ মানিবে না।

অবশেষে বাধ্য হইয়া গণেশকে বলিতে হইল—পাগল নাকি? মরা লোক কখনও বেঁচে ওঠে? ডাকলে সে কখনও ফিরে আসে? তুমি এত বোঝ আর এই ঠাট্টাটা বোঝ না?

বুলু চুপ করিয়া গেল। দাদার শোকে মুখখানি ম্লান করিয়া সে গণেশের কোলের উপর ছবির মত বসিয়া রহিল। চলিতে চলিত বুলুকে লইয়া গণেশ এমন জায়গায় আসিল যেখান হইতে আগুনের শিখা আর চোখে পড়ে না।

আগুন দেখিয়া হরলাল পাগলের মত হইয়া গেছে, কিন্তু এই আগুন সমস্ত কিছু গ্রাস করিয়া না পুড়াইয়া ক্ষান্ত হইবে না। কিছুই বাঁচান গেল না; যাহা কিছু লুট-করা জিনিস অন্যত্র সরাইতে পারে নাই—নানা রকম গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সব এইবার ধুলার সঙ্গে মিশিয়া গেল।

হরলাল গুপীকে দেখিতে পাইয়া গর্জন করিয়া উঠিল—গণেশ কোথায়?

গুপী ভয়ে পাংশু হইয়া গেল, কহিল—মেয়েটাকে নিয়ে কোথায় যেন সরে' পড়ল সে।

—সরে' পড়ল? সে কী? বলিয়া সে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল—গণেশ!

সে-ডাকের কোন সাড়া মিলিল না।

হরলাল ফের জিজ্ঞাসা করিল—আগুন লাগল কী করে'?

—ঐ মেয়েটাই লাগিয়েছে। বিছানায় কেরোসিন ঢেলে দেশলাই কাঠি ধরিয়ে দিয়েছে।

এমন সময় সনাতনের পিছে-পিছে কুণ্ঠিত শঙ্কিত মুখে অনিল আসিয়া দাঁড়াইল। দলের আরও কে-কে সব জড়ো হইয়াছে। হরলাল সনাতনের দিকে ফিরিয়া কহিল—ঐ মেয়েটারই নাকি এই কাণ্ড। গণেশ তাকে নিয়ে কোথায় নাকি গেছে—গুপী ত' বলছে তাই।

সনাতন কহিল—হয় ত' এইবারে ও মেয়েটার মাথা গুঁড়িয়ে দেবে। বড্ড মায়া পড়েছিল, না?

দাঁত কড়মড় করিয়া হরলাল কহিল—পেলে আমিই ছুঁড়ির মুণ্ডুটা চিবিয়ে খেতাম এখন!

সনাতন কহিল—এর পর আর কি সয়! কেটে-কুটে সত্যিই এবার ও একটা কাণ্ড করে' বসবে। একেবারে ক্ষেপে গেছে হয় ত'।

আস্তে-আস্তে অনিল একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। বুলু তাহা হইলে আগুনে পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যায় নাই—গণেশই তাহাকে সঙ্গে করিয়া কোথায় নিয়া গিয়াছে! আবার তাহার একটু-একটু করিয়া আশা হইতে লাগিল—হয় ত' গণেশ তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে পারিবে না, বড-জোর কোনও গাছের তলায় অচেনা জায়গায় রাখিয়া আসিবে।

হরলাল কহিল—কে জানে, হয় ত' ফৈজুর কাছে সোজা গেছে।

সনাতন সায় দিল—তাই হ'বে। আগে কিন্তু বেচতেও ওর আপত্তি ছিল বরাবর।

অনিলের মনে হইল, তাহাও সম্ভব নয়—এই রাতে সে কষ্ট করিয়া কি না তালতলা যাইবে মেয়ে বেচিতে! কে জানে, নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছে কি না!...তাই বৈ কি—তাই কি না গণেশ সেদিন নৌকাতে তাহাকে জলে

ভাসাইতে গিয়া শেষকালে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়াছিল—তারপর বাড়িতে নিয়া আসিয়া বুলুকে সাজাইবার সে কী ঘটা!

অনিল এক-পা দু-পা করিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল। তাহার উপর কাহারও তেমন আর এখন লক্ষ্য নাই।

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ক্ষতি কি হরলাল চুপ করিয়া সহিবে নাকি? হঠাৎ সে গুপীকে উদ্দেশ করিয়াই কর্কশ কণ্ঠে কহিল—তুই কী করছিলি? তোকে পাহারা দিতে রেখে গেলাম, আর তোরই চোখের সামনে ও আগুন ধরালে? বলিয়া বাঁ হাতের মুঠিতে তাহার চুলগুলি চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতে ধাঁ করিয়া গালে ভীষণ চড় বসাইয়া দিল।

তারপর একবার যখন প্রহারের বৃষ্টি শুরু হইল, তখন হরলাল আর থামিতে চাহিল না।

সনাতন চীৎকার করিয়া উঠিল—মাধোটা গেল কোথায়? ওরও ত' পাহারা দেবার কথা। অর্থাৎ মাধবকে কাছে পাইলে সেও তাহাকে এমনি ঠ্যাঙাইয়া হাতের সুখ করিয়া নিত। কিন্তু মাধব আগে-ভাগেই খসিয়াছে—শীগ্‌গির আর সে সনাতনের ঘুষি, কিল, লাথির নীচে পিঠ পাতিতেছে না নিশ্চয়ই। সনাতন অনিলকে প্রশ্ন করিল—মাধবকে কোথাও দেখেছিস্?

অনিল গম্ভীর হইয়া কহিল—মন্দির থেকে আসবার পথে দেখতে পেলে না? আমাদের দেখে একটা ঝোপের পাশে গা ঢাকা দিলে।

—কোন্ জায়গাটায় বল ত'?

অনিল আন্দাজে দূরে একটা জায়গার দিকে আঙুল তুলিয়া দেখাইল, কহিল—ঐ ত'।

কথাটা সম্পূর্ণ সনাতন বিশ্বাস না করিলেও মাধবেরই খোঁজে সে এ-দিক ও-দিক উঁকিঝুঁকি মারিতে মারিতে ক্রমশঃ আগাইতে লাগিল।

এদিকে গুপীর উপরে প্রহারের বৃষ্টি তখনও বিরাম মানিতেছে না! নির্জীবের মত গুপী অনেকক্ষণ সহিয়াছে, কিন্তু পেটে একটা লাথি মারিয়া হরলাল যখন তাহাকে দূরে ছিটকাইয়া ফেলিল, তখন সে আর মাটির উপর চুপ করিয়া শুইয়া রহিল না। হাতের কাছে ভারি একটা পাথরের টুকরা কুড়াইয়া পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আগুন তখনও সমানে জ্বলিতেছে—তাহারই আলোতে

হরলালের চওড়া কপালটা স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। গুপী সেই চওড়া কপাল লক্ষ্য করিয়া পাথরটা ছুঁড়িয়া মারিল। অব্যর্থ সন্ধান, হরলালের ডান ভুরুর উপর সজোরে লাগিয়া পাথরের টুকরাটা চোখের উপর হইতে কপালের খানিকটা বিদীর্ণ করিয়া দিল। চকিত আঘাতে ত্রস্ত বিমূঢ় হইয়া হরলালের মাথা ঘুরিয়া গেল, মুহ্যমান চোখে দেখিতে পাইল সামনে দিয়া গুপী ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া চলিয়াছে।

রক্ত পড়িয়া চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল বটে, তবু হরলাল বাঘের মত গর্জন করিতে-করিতে গুপীর পিছু নিল। আরও যাহারা কাছে দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদেরও হুকুম করিল অনুসরণ করিতে। কিন্তু এই ঘনঘোর অন্ধকারে কাঁটা-বন মাড়াইয়া সারা শরীর ক্ষতাক্ত করিয়া তুলিতে কাহারও সাধ হইল না। তবু হরলাল একাই ছুটিয়া চলিল। ঐ দুর্বিনীত গুপীকে খুন করিয়া তাহার কাঁচা রক্তে স্নান না করিলে তাহার শান্তি নাই।

অনিলের চারিদিক এখন প্রায় ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। আগুনের শিখা, আকাশের তারা ও দূরের ঐ চিহ্নহীন দিগন্ত-রেখা—সব যেন তাহাকে কী ইসারা করিতেছে! সে প্রথমটা আলগোছে ভিড় এড়াইয়া একটু ফাঁকায় আসিল ও যখন দেখিল সবাইর দৃষ্টি গুপী ও হরলালের দিকে নিবদ্ধ, তখন সে তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া বনের মধ্যে মিলাইয়া গেল। মনে হইল, কে যেন অদৃশ্য থাকিয়া তাহাকে সম্মুখের পথে আকর্ষণ করিতেছে।

গুপী সেই খোলা মাঠের পথ নিয়াছিল—অনিল ঢুকিল বনে। গুপী যেন উড়িয়া চলিয়াছে চপল একটা ফড়িংয়ের মত, আর হরলাল যেন একটা উন্মত্ত হাতী! কত দূর যায়, কিন্তু রক্তের স্রোতে হরলালের চোখের দৃষ্টি আবার ঝাপসা, বিবর্ণ হইয়া আসে—অন্ধকারে গুপীকে ঠিক আর অনুসরণ করা যায় না। তবুও সে দুর্দমনীয় কালবৈশাখীর মত ছুটিয়া চলে।

কিন্তু কোথায় গুপী! শূন্য মাঠ ভরিয়া অন্ধকার শব্দহীন ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে। হরলাল কপালের ক্ষতস্থানে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এই উদ্ধত অবিনয়ের আর শাসন করা হইল না। কিন্তু যাইবে কোথায়—গুপীকে সে যে করিয়াই হউক, বাহির করিবে।

ও-দিকে সনাতন মাধবকে খুঁজিয়া পাইল না। বাড়ির কাছে আসিয়া খোঁজ

করিয়া দেখিল অনিলও অদৃশ্য হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—হরলাল কোথায়, তাকে দেখছি না কেন ?

রতন বলিল—গুপীর পেছনে ধাওয়া করেছে মাঠের দিকে। ছোঁড়াটা এবারে মরল। বলিয়া হরলালের এই রাগের কারণটা সে বিবৃত করিল।

খানিক বাদে হরলাল শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিল। চোখের যন্ত্রণায় ও পথশ্রমের ক্লান্তিতে শরীর তাহার অসাড় হইয়া আসিয়াছে। সে শিরিষ গাছের তলায় ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল, সনাতনকে কহিল—শীগ্‌গির আমাকে একটু জল এনে দে—

যাইবার আগে সনাতন বলিল—সেই ছোঁড়াটাও সরেছে দেখছি !

—আর পারি না ! সব আমাদের গেল, সনাতন। হরলালের সে কী হতাশ স্বর—গণেশ এখনও ফিরে আসে নি ?

—না। কিন্তু ছেলেটাকে আমি ধরে' আনবই—কোথায় যাবে ? দাঁড়া, আগে তোকে জল এনে দি'।

হরলাল বাধা দিয়া কহিল—না, জল চাই না। তুই যা, দেখ ওকে ধরতে পারিস্ কি না। ও পালালে সব ভেস্তে যাবে। বংশীকে খবর দে, রতন—শীগ্‌গির। গুপী আমার কী করেছে দেখেছিস ?

সবাই ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল পাথরের আঘাতে হরলালের ডান চক্ষুটা একেবারে থেঁৎলাইয়া গিয়াছে।

চোখটা চাপিয়া ধরিয়া রক্তের স্রোত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে হরলাল বলিল—আমার জন্যে ভাবিস্ নে। আমারটা আমি করতে পারব। তোরা এখন দেখ্ ছোঁড়াটাকে পাস কি না। ছোরা-টোরা দু' একটা নিতে পারবি না ? পাবি না খুঁজে ? পিস্তলটায় ত' আর গুলি নেই।

সনাতন কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল—ওকে ধরতে আবার ছোরা-পিস্তল লাগে নাকি ? একেবারে টুঁটি টিপে ধরে' ঠাণ্ডা করে' দেব—তার পর দেব ভাসিয়ে। আসুক না লড়তে। চল রতন, আয় বিষ্ণুপদ ! তারপর মাধোকেও আমি দেখাচ্ছি।

হরলালের কেমন মনে হইল, সমস্তই নিষ্ফল আস্ফালন। গণেশ এখনও ফিরিয়া আসিল না কেন ?

অনিলের কাছে সমস্ত বন যেন পথ উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছে। সামনে ছাড়া কোন দিকে তাহার লক্ষ্য নাই—এই অন্ধকার উত্তীর্ণ হইয়া প্রভাতের দেশে সে অবতরণ করিবে। দুঃস্বপ্নের পর আবার সে জানালার ওপারে ভোরের শুকতারাটির মত মায়ের আশীর্বাদ স্নিগ্ধ কোমল মুখখানি দেখিবে। কে যেন তাহার মনে বসিয়া বলিতেছে—ভয় নাই, ভয় নাই!

পথের মাঝে সে কোন্ কাঁটা-গাছের শীর্ণ ও দীর্ঘ একটা ডাল কুড়াইয়া পাইল। সেটা সে সঙ্গে নিল—আততায়ী আসিয়া পড়িলেও সে বিনাযুদ্ধে হার মানিবে না। পকেট ভরিয়া ঢিল নিল—গুপীর কীর্তি ত' সে স্বচক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছে। নিজেকে হঠাৎ তাহার অত্যন্ত বলশালী মনে হইল—গায়ে যেন তাহার বাঘের শক্তি, চোখে তাহার রৌদ্রের তীব্রতা। ইচ্ছা করিলে সে হয় ত' নদীটাও সাঁতরাইয়া পার হইয়া যাইতে পারিবে।

অনিলের খোঁজে এক-একজন এক-এক দিকে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বংশীও খবর পাইয়াছিল। লণ্ঠন লইয়া সেও খুঁজিতে চলিয়াছে। আলো ছাড়া সে পথ চলিতে পারে না—সাপখোপের ভয় আছে, পৃথিবীতে আরও কত-কি ভয়ের জিনিস আছে তাহা ভাবিতেও তাহার ভয় করে। আলো একটা সঙ্গে থাকা ভাল।

সেই আলোটা অনিলেরই নিকটবর্তী হইতে লাগিল। এ আর অন্য লোক নয়—অনিল আলো দেখিয়া তাহাকে ঠিক চিনিয়াছে। নিমিষে তাহার সমস্ত উৎসাহ জুড়াইয়া আসিল—গায়ে সামান্য একটা খরগোসেরও শক্তি রহিল না। চারিদিকের উন্মুক্ত পথে সহসা প্রাচীর খাড়া হইয়া উঠিল—আবার সে বন্দী!

মনের মধ্যে বসিয়া ঠিক মা'র কণ্ঠস্বরে কে যেন বলিল—ভয় নাই।

চট করিয়া অনিলের মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। আর না ছুটিয়া সামনের একটা গাছে তরতর করিয়া সে উঠিয়া পড়িল। কি গাছ তাহা সে ভাল করিয়া চিনে না—অন্ধকারে চিনিবার উপায় নাই। লণ্ঠনটা ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছে।

অনিল তাড়াতাড়ি পরনের কাপড়টা খুলিয়া ফেলিল। হাতের সরু ডালটার ডগায় কাপড়ের একটা প্রান্ত আটকাইয়া অন্য অংশে নিজের

শরীরটাকে আগাগোড়া আবৃত করিয়া সে লম্বা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হাতটা মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়াছে—তাহার মধ্যে লম্বা সেই ডাল—ঘোমটার মত করিয়া কাপড়ের উপরের ধারটা নুইয়া পড়িয়াছে—সমস্ত দৈর্ঘ্যটা অনিলের স্বাভাবিক চেহারার দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। মুখ হাত-পা দেখা যায় না, খালি একটা শাদা কাপড় গাছের উপর খাড়া হইয়া ঝুলিতেছে।

অনিল কাঠির ডগাটা আস্তে-আস্তে নাড়িতে লাগিল। দূর হইতে ঠিক মনে হইবে যেন গাছের উঁচু ডালে একটা পেত্নী বসিয়া ঘোমটার তলায় মাথা নাড়িয়া-নাড়িয়া লোকজনকে নীরবে আহ্বান করিতেছে—আয়, আয়; আমার কাছে আয়!

লণ্ঠনটা আরও কাছে আসিল বুঝি, অনিল নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ঈশ্বরের নাম লইতে লাগিল।

গাছের উপরে ঐ মূর্তি দেখিয়া বংশী দেখিতে দেখিতে বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ডালের উপর পেত্নী বসিয়া ঘোমটা নাড়িয়া তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিতেছে। সমস্ত বন কাঁপাইয়া শন শন করিয়া হাওয়া বহিল—পেত্নীটা যেন নাকি-স্বরে কথা কহিয়া উঠিল। হাওয়ায় একটা শুকনো ডাল খসিয়া পড়িল, পেত্নীটা তাহারই মাথা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল বুঝি।

—বাবা গো, মা গো। গেলাম গো, মেরে ফেললে গো!—বলিয়া বংশী চোঁচা দৌড় মারিল। যত ছোটে ততই মনে হয় পেত্নীটা যেন তাহাকে তাড়া করিতেছে—এই বুঝি ধরিয়া ফেলিল। একেবারে বাড়ি ফিরিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দিল সে। তবু তাহার স্বস্তি নাই—পেত্নীটা জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। জানালাটাও বন্ধ করিল। তারপর পেত্নীটা তাহার ঘরের চালে দাপাদাপি শুরু করিল। বংশী বাকি রাত ঘুমাইতে পারিল না।

বংশী অদৃশ্য হইয়া গেলে অনিল স্বস্তির নিশ্বাসে দুশ্চিন্তার পাথরটা সরাইয়া দিয়া একলাফে নামিয়া পড়িয়াই আবার ছুট দিল—আর তাহাকে আটকাইবে কে? অতি কাছেই খালের জল কুলকুল করিয়া তাহাকে ডাকিতেছে—শেষরাত্রে জোয়ার আসিয়া গিয়াছে বুঝি।

রাত্রি এখন শিশুর চোখের মত তরল হইয়া আসিয়াছে। ভোর হইতে আর দেরি নাই।

খালের ধারে একটা নৌকা বাঁধা। তাহারই জন্য যেন কে তৈয়ার রাখিয়াছে। সদ্য ঘুম ভাঙিয়া মাঝি একটা ছইয়ের ভিতরে কাহাকে কি যেন বলিতেছে। অনিলের ভয় করিতে লাগিল। তবু সে ডাকিল—মাঝি!

মাঝি চাহিয়া দেখিল। কহিল—সোয়ারি আমি আর নিতে পারব না।

মাঝির এই কথায় বিপদের আশঙ্কাটা খানিক প্রশমিত হইল। অনিল কহিল—দয়া করে' নিয়ে চল মাঝি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। ষ্টীমার ঘাটে পৌঁছে দাও, তোমাকে আমি অনেক—অনেক বকশিস দেব।

বাহিরের লোককে না শুনাইয়া ছইয়ের ভিতর হইতে কে তীব্র চাপা গলায় প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—না, গফুর, খবরদার। আর কাউকে নিতে পারবে না। আজকের দিনে আমার একটা কথা রাখ। সেই রাত্রির কথা মনে আছে?

গফুর বলিল—আচ্ছা। বলিয়া সে নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নৌকাটাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া অনিল নৈরাশ্যে একেবারে ক্লান্ত হইয়া উঠিল। আর্তকণ্ঠে আবার ডাক দিল—আমাকে তুলে নাও মাঝি, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।

নৌকাটা তবু থামিল না। অনিল দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

এই দৃশ্য দেখিয়া গফুর চঞ্চল হইয়া উঠিল; কহিল—ছেলেটা জলে পড়ল যে। সক্কালবেলা মারা যাবে নাকি? শেষকালে একজনের আত্মহত্যার পাপের ভাগী হ'ব?

ভিতরের আরোহীর কোন কথায়ই সে কান পাতিল না। তাড়াতাড়ি নৌকা ঘুরাইয়া জলে নামিয়া অনিলকে সে নৌকায় তুলিয়া আনিল।

অনিল স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িবে—কিন্তু ও কে? ছইয়ের ভিতর ছালার চট্ মুড়ি দিয়া চোখ মুখ ঢাকিয়া জড়োসড়ো হইয়া কে বসিয়া আছে!

এ আবার কোন কারসাজি! অনিলের মুখ ব্লটিং-কাগজের মত শাদা হইয়া গেল। মুক্তি কি তাহার মিলিবে না তবে?

ষ্টীমারের চোঙাটার কাছে গরম বলিয়াই আর কেহ সেখানে বসে নাই—

গণেশ বুলুকে সেইখানে একখানা চাদর বিছাইয়া দিয়া কহিল—এখানেই বসা যাক্। ভারি ভিড় হয়েছে, দেখছি।

বুলু সেইখানে বসিয়া আনন্দে দুই চক্ষু মেলিয়া ধরিয়া নদী দেখিতে লাগিল। তাহা হইলে সত্যই সে বাড়ি চলিয়াছে।

সকালে হাটে গিয়া গণেশ চেনা এক স্যাকরার কাছে বুলুর গলার হার বেচিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছে। তারপর একটা হোটেলে গিয়া কলাপাতায় করিয়া বুলুকে ভাত খাওয়াইল। গণেশকেও খাইতে হইল—নইলে মেয়েটা ছাড়িবে না। তারপর একখানা ধোয়া কাপড় ও একটা ডুরে শার্ট কিনিয়া গায়ে আঁটিয়া গণেশ দেখিতে-দেখিতে ভদ্রলোক হইয়া গেল।

বুলু হাসিয়া কহিল—তোমাকে ঠিক এখন বাবার মুহুরির মত দেখাচ্ছে।

হ্যাঁ, কাপড়-চোপড় পরিয়া ভদ্র না সাজিলে যদি লোকে সন্দেহ করে! মেয়ে চুরি করিয়া পলাইতেছে বলিয়া তাহাকে যদি পুলিশের হাতে ধরাইয়া দেয়! চুরি করিয়াই সে পলাইতেছে বটে—চুরি না করিলে বুলুকে আজ আর কী করিয়া উদ্ধার করা যাইত?

ষ্টীমারে একজন ভদ্রলোক বুলুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—কোথায় যাচ্ছ?

বুলু গম্ভীর হইয়া বলিয়াছিল—কলকাতায়।

—সঙ্গে ও কে?

—আমাদের মুহুরিবাবু। আমার বাবা যে হাইকোর্টের উকিল।

—একা-একা যাচ্ছ যে! সঙ্গে আর কেউ নেই?

—বা, মুহুরিই ত' আছে। ও না থাকলেও আমি যেতে পারতাম। ষ্টীমার রাত্রে গোয়ালন্দ পৌঁছবে—রাত্তির কটায় বলুন ত'? তারপর নেমেই ট্রেন তৈরি—চা খাবার আগেই বাড়ি যাওয়া যাবে। কেমন, ঠিক বলছি না, আমি?

ভদ্রলোকটি আর কোন প্রশ্ন করিল না, সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—মেয়ে দেখছি ধুরন্ধর।

বুলু গণেশকে এমনি অগাধ বিশ্বাস করিয়াছে! ডাকাত জানিয়াও পাঁচজন ভদ্রলোকের সাহায্য লইবার জন্য ষ্টীমারে উঠিয়াও চেঁচামেচি করে নাই। ঠিক তাহার হারানো টগরের মতই সরল বিশ্বাসে তাহার উপর নির্ভর করিয়া

আছে। গণেশকে সে তাহার বাড়ি নিয়া যাইবেই—এত যে তাহার উপকার করিল, তাহাকে সে মা'র হাতের খাবার খাওয়াইবে—কত দামী জিনিস উপহার দিবে—যা সে চায়! বড় হইয়া ডাক্তারি করিবার সময়ও তাহার কথা বুলু ভুলিবে না।

গণেশ বলিয়াছিল—কিন্তু ডাকাত জেনে তোমার বাবা যদি আমার হাতে হাতকড়া লাগান?

—বা, আমি তা' জানতেই দেব কিনা? যে ডাকাত, সে বুঝি মেয়ে খুঁজে বাড়ি ব'য়ে দিয়ে যায় কখনও? তা' ছাড়া আমি তোমাকে কত ভাল বলব, দেখ। কিসের তুমি ডাকাত—তুমি আমাদের মুহুরি। বলিয়া বুলু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভোঁ. দিয়া ষ্টীমার ছাড়িল। চাকার শিকলে টান পড়িল। দুই পাশে ফেনার ফুল ফুটাইতে-ফুটাইতে ষ্টীমার আগাইয়া চলিল।

দাদার কথা ভাবিয়া বুলু চোখের জল আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। দাদা যদি এখন সঙ্গে থাকিত। মাকে গিয়া সে কী বলিবে?

দাদার কথা জিজ্ঞাসা করিলেই গণেশ চুপ করিয়া যায়। কি-রকম করিয়া যেন তাকায়। সেই চাউনি দেখিলে বুলুর ভারি ভয় করে। গণেশের সঙ্গে লুকানো অস্ত্র আছে কি না কে জানে। আচমকা যদি তাহাকেও ঘায়েল করিয়া বসে! সেই ভয়েই সে ও-কথার ধার ঘেঁসে না। অন্য কথা পাড়িলেই গণেশের চোখ-মুখের ভাব স্নিগ্ধ হইয়া আসে।

গণেশ ঠোঙায় করিয়া চিনি ও কলাপাতায় করিয়া পাতক্ষীর লইয়া আসিল।

বুলু অবাক হইয়া কহিল—ষ্টীমারের মধ্যেই দোকান আছে নাকি? আসবার সময় ত' দেখিনি। তখন ছিলাম একটা ঘরের মধ্যে গদি-ওলা বিছানায় শুয়ে—সেকেণ্ড ক্লাশে। তা' কী আনলে, সর্দার?

গণেশ চাপা গলায় কহিল—সর্দার না, মুহুরিবাবু।

—হ্যাঁ; মুহুরিবাবু, কী আনলে?

গণেশ হাসিয়া কহিল—পাতক্ষীর। সেই বংশী তোমাদের খাওয়াবার লোভ দেখিয়েছিল না? এই দেখ। খেয়েছ কোনদিন?

পাতক্ষীর দেখিয়া বুলুর আবার দাদার কথা মনে পড়িয়া গেল। কান্না-

ছলছল চোখে কহিল—ও আমি খাব না। দাদাকে ফেলে ও-জিনিস আমি মুখে তুলতে পারব না। আমার খিদে নেই একটুও।

একবার যখন ঘাড় বাঁকাইয়াছে শত তেল মাখাইয়াও বুলুর সে-ঘাড় আর সোজা করা যাইবে না।

ষ্টীমারের একটানা ঝকঝক শুরু হইয়াছে—ভীষণ গরম, যাত্রীদের কোলাহলের অবধি নাই। হাসাহাসি, ঝগড়া, চেঁচামেচি, হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান—তুমুল একটা হাট বসিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে বলু নিতান্ত স্তব্ধ হইয়া দাদার কথা ভাবিতেছিল। সে এখন কোথায়—কত দূরে না-জানি চলিয়া গিয়াছে! বুলুর এই ষ্টীমারে করিয়া বাড়ি যাওয়া কি সে দেখিতেছে না? ছোট বোনটির জন্য এতদিনে বুঝি সে নিশ্চিন্ত হইল।

চোখের জল মুছিয়া বুলু কহিল—আমাকে যে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ, সেখানে যদি মা-বাবাকে দেখতে না পাই? তাঁরা যদি এখনও না ফিরে থাকেন?

—পাগল! গণেশ তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল—বাড়ি ফিরবেন না? তাঁরা সেইদিন সকাল বেলায়ই নৌকো পেয়েছেন। বাড়ি গিয়ে বাবার কোলে চড়ে' আমাকে ভুলে যাবে, বুলু?

গণেশ বুলুর চুলে হাত বুলাইতে লাগিল।

বুলু কহিল—ককৃখনও ভুলব না। এত যে উপকার করে তাকে আবার লোকে ভোলে নাকি? আমাকে কি তুমি গুপী ঠাওরালে যে, যে-লোক কাঁধে চড়ে' খাবার তুলে দেয় তাকে বেঁধে রাখব?

গণেশ কহিল—তোমার গলার হার পর্যন্ত বেচতে হ'ল। দিতে ত' কিছু পারলামই না, বরং—

—বেচবে না? না বেচলে টিকিটের পয়সা হ'ত কী করে'? ভাগ্যিস ওটা ছিল। চল না, তোমাকে মা'র একটা নেকলেস দিয়ে দেব। তার পর বড় হ'য়ে—

—বড় হ'য়েও আমাকে মনে রাখবে? বড় হ'য়ে তোমার যখন বিয়ে হ'বে—তখন?

—হ্যাঁ, ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখে জানিয়ে ঠিক নেমন্তন্ন করব, দেখ।

—যখন আমি খুব বুড়ো হ'য়ে যাব?

—হ্যাঁ, এস আমার বাড়ি। আমার বাগানের মালী হ'বে। তুমি এ-কাজ ছেড়ে দাও; সর্দার।

গণেশ হাসিয়া কহিল—ছেড়ে ত' দিয়েইছি। আমি ত' আর সর্দার নই, আমি ত' তোমাদের মুহুরি! তোমার বিয়ে যদি কোন হাকিমের সঙ্গে হয়, আমাকে তবে তোমার বরের দপ্তরী রাখবে?

মুখ ভীষণ গম্ভীর করিয়া বুলু কহিল—তা' আমি কী করে' বলব? আমি নিজে হাকিম হ'লে বরং বলতে পারতাম! কিন্তু কী গরম দেখেছ! রেলিঙের পাশে একটু গিয়ে দাঁড়াই না?

গণেশ কহিল—না!

বুলু আর অনুরোধ করিল না। রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া একা-একা সে কী দেখিবে? পাশে আজ দাদা নাই। সে কতদূরে—কোথায় না-জানি চলিয়া গিয়াছে এতক্ষণে!

গোয়ালন্দে গণেশ বুলুকে লইয়া ট্রেনে উঠিল—থার্ড-ক্লাশ কামরায় সাঙ্ঘাতিক ভিড়। তবু এমন একটি ফুটফুটে মেয়ে দেখিয়া সবাই জায়গা ছাড়িয়া দিল। অনেকেই গায়ে পড়িয়া গল্প-গুজব করিতে আসিল, কিন্তু গণেশের নির্দেশমত বুলু কহিল—আমার বেজায় ঘুম পাচ্ছে। আর বকতে পারি না। বলিয়া হাঁটু দুইটা বুকের কাছে গুটাইয়া কোনরকমে শুইয়া পড়িল।

আর শুইয়া পড়িয়াই একেবারে তাহার সারা গা ভরিয়া ঘুমের বন্যা নামিয়া আসিল তখন তখনই।

নৈহাটির পরেই ট্রেনের কামরাটা অনেক পাৎলা হইয়া আসিল। তাহার পর বারাকপুর! বুলু তখনও বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে—মুখে কি মধুর সারল্য, শেষরাত্রির আকাশের মতই মুখখানি কোমল, লাবণ্যময়! সে-মুখে বেদনার কোমল একটু আভা পড়িয়াছে।

দমদম পার হইতেই গণেশ বুলুকে ঠেলিয়া তুলিল; কহিল—কলকাতা এসে পড়ল এবার।

চোখ কচ্‌লাইয়া বুলু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল! হ্যাঁ, এই ত' উল্টাডিঙির ব্রীজ—নৌকা কতকগুলি জড়ো হইয়া আছে। ঐ ত' দূরে একটা মোটর চলিয়া গেল—ঠিক, আর ভুল নাই। বুলু হর্ণ শুনিতে পাইতেছে।

প্লাটফর্মের বাহিরে আসিয়া বুলু কহিল—ঐ ত' বাস দাঁড়িয়ে—

গণেশ কহিল—বাস নয় ট্যাক্সি নিলে ঢের আগে বাড়ি যাওয়া যাবে। বাস্‌-এ অনেক ভিড়।

ট্যাক্সি পিচের রাস্তা ধরিয়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাস্তার দুইধারে বাড়িগুলি তেমনি অটুট—এই কয়দিনের অদর্শনে কলিকাতার কিছুই বদল হয় নাই। বুলু ভাবিয়াছিল সে নাই বলিয়াই হয় ত' কলিকাতা অভিমানী বন্ধুর মত মুখ ভার করিয়াছিল—হয় ত' ছিল, কিন্তু তাহাকে কাছে পাইয়া আগের মতই হাসিয়া উঠিয়াছে।

ল্যান্সডাউন রোড—ও মা, ইহারই মধ্যে ল্যান্সডাউন রোডে আসিয়া পড়িয়াছে! আর কি, মার্কেটের পাশ দিয়াই ত' তাহাদের বাড়ি যাইবার গলি।

বুলু গণেশের মুখের দিকে চাহিল। সে-মুখ কেমন থম্‌থমে, দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে মনে হইল।

বাড়ি যতই কাছে আসিতে লাগিল ততই বুলু দুঃখে মুষড়িয়া পড়িতেছিল। এতবড় দুঃসংবাদ সে কেমন করিয়া শুনাইবে? আবার সে জিজ্ঞাসা করিল —সত্যিই ওরা দাদাকে মেরে ফেলেছে, সর্দার?

এত ক্ষতি ও বিফলতার পরেও যে হরলাল আর সনাতন অনিলকে ছাড়িয়া দিবে তাহা গণেশের মনে হইল না। একে তাহার কোপ বসাইতে এক সেকেণ্ড দেরি হইল, তাহার পর বুলু ঘরময় আগুন ধরাইয়া দিল—তাহারা যে বাগে পাইয়াও অনিলকে ছাড়িয়া দিবে তাহা গণেশ কী করিয়া বিশ্বাস করে? গণেশের খড়্গ হইতে সে রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু দলের মধ্যে একলা সেই ত' অস্ত্র চালনা করে' না। এখন নিশ্চয়ই আর সে বাঁচিয়া নাই। বুলুকে মিথ্যা আশা দিয়া লাভ কী? গণেশ কহিল—এমন রাতে ছেড়ে দেবার জন্যে ত' কাউকে কালী-মন্দিরে নিয়ে যায় না, বুলু। মনে হয়, দাদা তোমার নেই।

বুলু অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার পর ড্রাইভারকে কহিল—ডাইনে যাও।…ঐ—ঐ আমাদের বাড়ি।

সদর বন্ধ, জানালায় জাপানী পর্দা ঝুলিতেছে ; ঐ পর্দাটা ত' বুলুই সেলাই করিয়াছিল—রাস্তায় সদ্য জল দিয়া গিয়াছে—এখনও কাহারও ঘুম ভাঙে নাই। রোয়াকে রাস্তার লোক শুইয়া আছে।

গণেশ কহিল—ঐ তোমাদের বাড়ি ?

বুলু দোতলার বারান্দার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—হ্যাঁ, এই ত' দরজার ওপরে বাড়ির নম্বর লাগান আছে, দেখছ না ? ওপরে ঐ ত' আমাদের পড়ার ঘর।

গণেশ মলিন মুখে কহিল—বড় হ'য়েও আমাকে চিনতে পারবে, বুলু ? বাগানের মালী রাখবে ?

সে-কথায় কান না দিয়া বুলু কহিল—দাঁড়াও, আগে দেখি বাড়িতে মা ওঁরা ফিরেছেন কিনা—এখুনি তোমাকে নেকলেস্ কী করে' দিই ?

—নেকলেস্ আমি চাইছি নাকি ?

—আচ্ছা, নগদ টাকাই দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, মা আছেন, সর্দার। দড়িতে তাঁর সেই শাড়ি ঝুলছে—যেটা সেদিন তাঁর পরনে ছিল। বলিয়া কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে ছুটিয়া রোয়াকে উঠিয়া দুই হাতে কড়া নাড়িতে লাগিল।

কাহারও কোন সাড়া-শব্দ নাই যে! ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল গণেশও কখন অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া কোথায় গেল সে ? সে কী নেকলেস্ নিবে না ? এ-দিক ও-দিক চাহিয়া দেখিল, কোথাও সে নাই। সহসা বুলুর অত্যন্ত ভয় করিতে লাগিল—মনে হইল, তাহাকে ধরিয়া নিবার জন্য আবার কাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া নির্জন রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে হয় ত'। গণেশই তাহাদের সর্দার।

বুলু দরজার উপর লাথির পর লাথি মারিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া কহিল—শীগ্‌গির দরজা খুলে দাও মা, আমি বুলু এসেছি—আমাকে আবার কারা সব ধরতে এল বুঝি—শীগ্‌গির নেমে এস, মা। ও মা!

বুলুর এই চীৎকারে ঘরের মধ্যে নিদ্রোত্থিতদের তুমুল সোরগোল পড়িয়া গেল। যেন ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হইয়াছে! সিঁড়ি দিয়া একসঙ্গে নামিতে গিয়া কেউ কেউ হোঁচট খাইল, সহসা কী যে হইল ঠিক কেহ বুঝিল না।

মা ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন।

—বুলু, বুলু যে! আমার বুলু এসেছে!

তীরের উপরে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত বুলু মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। চতুর্দিক হইতে শত-সহস্র কণ্ঠের প্রশ্ন শিলাবৃষ্টির মত নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল—কেমন করিয়া আসিল, কোথায় ছিল এই কয়দিন একেবারেই খাইতে পায় নাই বুঝি! কিন্তু সবারই প্রশ্ন ভেদ করিয়া মা'র স্বর তীরের মত বুলুর বুকে আসিয়া বিঁধিল—তিনি কহিলেন—অনিল? অনিল কোথায়? অনিল আসে নি?

বুলু মা'র কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল—দাদাকে ডাকাতরা কাল রাতে কালীমন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলি দিয়েছে!

—এ্যাঁ? কী বল্লি? সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া মা বৈঠকখানার একটা তক্তপোষে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। আনন্দে ও দুঃখের উত্তেজনায় বুলুও অসাড় হইয়া পড়িল।

তুমুল কান্না লাগিয়া গেল।

অমরেশবাবু বুলুর কাকাকে কহিলেন—থানায় গিয়ে শীগ্‌গির একটা খবর দিয়ে এস, কুমার। ইন্‌স্পেক্টারবাবু যেন একবার আসেন। এতদিনে ত' কিছু সুবিধে করতে পারলেন না, বুলু এবার যথেষ্ট ক্লু দিতে পারবে। যাও। পরে স্ত্রীকে বলিলেন—একটু থাম, আগে শুনি সবটা।

কিন্তু অমরেশবাবু আর কী শুনিবেন? বুলু বলিল—সর্দার-ডাকাত নিজে বলে দিয়েছে, অনিল আর নাই। অমরেশবাবু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

বুলুর পিসিমা কহিল—অন্তত একজনকে ত' পেয়েছ, তাকেই বুকে করে' থাক, বৌ।

বুলু কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—আমি না ফিরে দাদা ফিরলে কত ভাল হ'ত। আমি মেয়ে—আমাকে দিয়ে কী কাজ হ'বে? আমাকে কেন বলি দিল না!

পিসিমা তাড়াতাড়ি বুলুকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন।

কতক্ষণ বাদেই ইন্‌স্পেক্টারবাবু আসিয়া পড়িলেন। কুমার বলিল—এখন দয়া করে' তোমরা একটু থাম। ব্যাপারটা সব শোনা যাক্ আগে—

কিন্তু গণেশের কথা অবিশ্বাস করিবারই বা কী আছে?

চটের ভিতর হইতে লোকটা মিট্‌মিট্‌ করিয়া তাকাইতেছে, অথচ অনিলকে তক্ষুনি আক্রমণ করিতে আগাইয়া আসিতেছে না। নৌকা চলিয়াছে বটে। গোফুর বলিল—অমন ধারে গিয়ে দাঁড়িও না বাবু, পড়ে' যাবে। আচ্ছা বিনি-পয়সার কিরায়া পেলাম আজ! সক্কালবেলাতেই অমনি—

অনিল ইচ্ছা করিয়াই ধারে দাঁড়াইয়াছিল, লোকটা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেই জলে ঝাঁপাইয়া সে পড়িবে। পদ্মপুকুরে নামিয়া সে বৃথাই আর সাঁতার শিখে নাই। লোকটার সঙ্গে সাঁতারেরই প্রতিযোগিতা করিয়া দেখিবে—আগের মত সহজে সে ধরা দিবে না।

লোকটা আস্তে-আস্তে মুখের আবরণ উন্মোচন করিল। শরীরের সমস্ত চেতনা দুই চোখের দৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত করিয়া অনিল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

লোকটা গায়ের খোলস খুলিয়া ফেলিয়া কহিল—তুই? অনিল।

অনিলও তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিল—আরে, গুপী নাকি? আমাকে ধরিয়ে দিবি না ত'?

গুপী হাসিয়া কহিল—তুই আমাকে ধরিয়ে দিবি না ত'? বোস্ এখানে। ওরে গোফুর, একটু জোরে বেয়ে চল্ ভাই।

দুইজনে ছইয়ের মধ্যে পাশাপাশি বসিল। গুপী কহিল—খুব দেখা হয়ে গেল ভাই। আমার প্রথমটা এমন ভয় হয়েছিল—

অনিল কহিল—আর আমি ত' জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে রেডি ছিলাম।

গফুর টিপ্পনি কাটিয়া বলিল—এত তোদের ভাব, অথচ ওকে কিনা তুই ফেলে যাচ্ছিলি, গুপী?

গুপী জিজ্ঞাসা করিল—এখন তুই কোথায় যাবি?

—আগে ষ্টীমার-ঘাটে ত' পৌছে দিক্, তারপর দেখা যাবে!

—বাড়ি যাবি ত'?

—হ্যাঁ, যদি আর না ধরে।

—আর ধরতে দিলে ত'? আমরা এখন ষ্টীমার ঘাটে না গেলাম—ওরা নিশ্চয়ই ও-পথে ওৎ পেতে আছে। আমরা যাই এখন বেল-তলি, সেখানে থাকবার জায়গা পাওয়া যাবে—পায়সাও কিছু তোর যোগাড় করে' দিতে পারব হয় ত'। একদিন জিরিয়ে গেলেই ভাল হ'বে।

অনিল রাজি হইল। কহিল—কিন্তু এই মাঝিকে কী দেওয়া যাবে ?

—গফুরকে ? ওকে একবার যা বাঁচিয়েছিলাম তাই মনে করে' আবার পয়সা নেবে নাকি ? সেবার ডাকাতি করতে যাব—হঠাৎ আর একটা নৌকোর দরকার হ'ল। ডাক পড়ল গফুরের। ও কিছুতেই নৌকো দেবে না। হরলাল ওকে এই মারে ত' সেই মারে। আমি আলগোছে ওর হাতে একটা ছোরা চালান্ করে' দিলাম। 'ডাকাতের বাপ ডাকাত' বলে' হরলাল ভাগ্‌ল। সে-কথা মনে আছে, গফুর ?

গফুর বলিল—কিন্তু ওরা এসে টুঁটি কামড়ে ধরে' সব না ভুলিয়ে দেয় এবার !

গুপী বলিল—তোর সব ফাঁকির রাস্তা দিয়ে বেয়ে চল্। বুঝলে অনিল, গফুর সেদিনের সেই উপকারের কথা ভোলে নি। তোমরা সেদিন আমার খিদের সময় মুখের সামনে খাবার তুলে ধরেছিলে, সেই উপকারের কথা আমি ভুল্‌লাম কী করে' ? বুলুকে কি না মোটা একটা লতা দিয়ে বেঁধে রাখলাম !

থামিয়া আবার সে কহিল—কিন্তু সে-পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি এখন করব, অনিল। ডাকাতের দলে থেকে একেবারে অধঃপাতে গেছি—কী বলিস গফুর ? কোথায়ই বা যাব ? কেই বা আমার আছে ?

অনিল কহিল—কিন্তু ওদের দলে ফিরে যাবার ত' আর রাস্তা নেই।

গুপী হতাশার সুরে কহিল—রাস্তা কোথায়ই বা আছে ? সেই সব দুঃখের কথা তুমি বুঝবে না, অনিল। আর যখন আমাদের দেখা হ'বে না, তখন বলেই বা আর লাভ কী ?

—আর দেখা হ'বে না কেন ?

গুপী কহিল—কী করে'ই বা হ'বে ? কোথায় ভেসে যাই, ঠিক কী ?

এই কথায় অনিলের মন ভারি উদাস হইয়া উঠিল—বুলুর সঙ্গেও কি আর তার দেখা হইবে না ? শেষকালে গণেশই নিজে তাহার গায়ে হাত তুলিল ?

গুপী পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে বটে। সারাদিন কোথায় কোন্-কোন্ চেনা বাড়িতে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া চাহিয়া-চিন্তিয়া সে পয়সা যোগাড় করিল—গফুরের কোন্ আত্মীয়-বাড়িতে পরম পরিতোষের সহিত দুইজনে মুর্গি আর পরোটা খাইল ; রাত্রে শুইবার একটু জায়গা করিয়া লইল—আর রোদ

উঠিতেই আর একটি লোক নিয়া গফুরই ষ্টেশন-ঘাটে তাহাদের পৌঁছাইয়া দিল। কোথাও ডাকাতদের ক্ষীণ একটু ছায়াও পড়িল না।

দুপুরে ষ্টীমার আসিবে—ততক্ষণ দুইজনে বঁড়শী যোগাড় করিয়া মাছ ধরিল। নৌকা হইতে গফুরের একটা ময়লা চাদর পরিয়া একসঙ্গে দুইজনে স্নান করিল ও ষ্টেশনের দোকান হইতে টাট্‌কা মুড়ি, ফেনি বাতাসা ও খুরিতে করিয়া চা কিনিয়া আনিয়া তাহারা চমৎকার ফলার করিল।

ষ্টীমার আসিতেছে।

কিন্তু গুপী টিকিট কাটিল মোটে একজনের। টিকিট্‌টা অনিলের হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া গুপী কহিল—নে, উঠে পড়্; সিঁড়ি দিয়েছে।

অনিল কহিল—এই যে বললি, তুই আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় যাবি?

তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া গুপী কহিল—পাগল! আমার যাবার জায়গার অভাব কোথায়! নে, ওঠ্ এবার, মন খারাপ করিসনে—বাড়িই ত' ফিরে যাচ্ছিস্? তোর দুঃখ কী তবে?

সিঁড়ির তক্তায় উঠিয়া অনিল আবার কহিল—এখন কোথায় যাবি তবে?

গুপী কহিল—যে-দিকে দু' চোখ যায়। পৃথিবীতে যার কেউ নেই তার আবার ভাবনা আছে নাকি? বলিয়া সে অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টায় গুন্‌গুন্ করিয়া গান ধরিল।

ষ্টীমারটা চলিতে শুরু করিয়াছে।

রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া অনিল অপলক চোখে তাহারই দিকে চাহিয়া আছে বুঝি। আকাশে খট্‌খটে রোদ থাকিলেও গুপী দেখিল সমস্ত কিছু কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। ষ্টীমারটিকে আর দেখা যায় না—তাহার দুই চোখে অশ্রুর নদী দুলিয়া উঠিয়াছে! বুকের মধ্যে ষ্টীমার চলার শব্দ অব্যক্ত হাহাকারের মত কেবলি বাজিতে লাগিল অনিলের।

কলিকাতা শহরটা অনিলের কাছে একটা প্রাণবান দানব বলিয়া মনে হইত—কিন্তু ভোরবেলায় শিয়ালদহে ট্রেন আসিলে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সেই দানবটা শরবিদ্ধ ঈগলের মত মুহ্যমান হইয়া পড়িয়া আছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে

তার চাঞ্চল্য নাই, দুই চোখ অন্ধের দৃষ্টির মত করুণ ও উদাস—মুখভাবে শোকের বিষণ্নতা।

সঙ্গে তাহার বুলু নাই আজ। দাদা হইয়া ছোট বোনটিকে সে রক্ষা করিতে পারিল না কোনক্রমেই! তাহাকে সেই জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিয়া সে 'একলা চলিয়া আসিয়াছে।

অনিল একটা বাস লইল। রাস্তা ঘাট এখনও প্রায় নির্জন, শহরটা মৃতপ্রায়। আবার নিঝুম ভোরবেলা—জনশূন্য রাস্তা—চিত্রার্পিতের মত নিস্তব্ধ শহরের সমস্ত বাড়িগুলি।

মা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন—বুলুকে কোথায় রাখিয়া আসিলি? তখন সে-লজ্জা ও দুঃখ সে রাখিবে কোথায়?

মা-বাবারাও নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছেন কি না কে বলিবে?

অত্যন্ত অপরাধীর মত ম্লান কুণ্ঠিত মুখে রোয়াকে দাঁড়াইয়া অনিল অতি আস্তে-আস্তে কড়া নাড়িতে লাগিল। তাহার প্রত্যাবর্তনটা যুদ্ধজয়ীর মত নয়, হারিয়া গিয়া মুখে চুন-কালী মাখিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের মতই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। কড়া-নাড়ার শব্দ উপরে গেল না, নীচে সুখিয়া চাকর শুইয়া ছিল, সে আসিয়া দরজা খুলিল।

এবং দরজা খুলিয়াই সে হাঁ হইয়া গেল। হারানো অনিলকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াও সুখিয়া আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল না। কপালে চোখ তুলিয়া সে কয়েক পা পিছাইয়া গেল!

অনিল কহিল—কি রে সুখিয়া? আমাকে চিন্‌তে পারছিস্ না—?

সুখিয়া অনিলকে চিনিবে কি, টেবিলের পায়ার গুঁতা খাইয়া, দরজার উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া, দরজার পর্দা ছিঁড়িয়া মরি-বাঁচি করিয়া উপরে ছুটিয়া গেল। অমরেশবাবুর ঘরের দরজায় সজোরে ধাক্কা মারিতে মারিতে সে তারস্বরে কহিল—শীগ্‌গির দরজা খুলুন বাবু, নীচে দাদাবাবুর ভূত এসেছে! সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া সুখিয়া ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল!

অমরেশবাবু দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—কী বলছিস যা-তা? ভূত কি রে হতভাগা? বলিয়া তাহাকে ধম্‌কাইয়া দিলেন।

সুখিয়া বলিল—হ্যাঁ বাবু, দরজা খুলে দিতেই বৈঠকখানায় এসে ঢুকলে।

অমরেশবাবু কহিলেন—যা যা, এখন নিশ্চয়ই চলে' গেছে। কাল রাতে ঠেসে খুব গাঁজা খেয়েছিস বুঝি? যা, দরজা বন্ধ করে দে।

—কী হয়েছে? বলিয়া অনিলের মাও তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পিছনে বুলু।

—কী-নাকি এক ভূত দেখেছে। যত আজগুবি —মাথামুণ্ডু!

অমরেশবাবু কহিলেন—নীচে এখন বসে' আছে কি না! তুই যা না নেমে। ভূত আর কাকে বলে? তু-ই ত' একটা আস্ত ভূত, দেখছি।

সুখিয়া তখনও দেয়াল ধরিয়া কাঁপিতেছে।

কুমার বলিল—যাই বল, শীগ্‌গিরই গয়ায় একটা পিণ্ডি দেবার ব্যবস্থা করা দরকার।

নীচে অনিল খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু কেহই নামিয়া আসিল না দেখিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। বুলুকে সঙ্গে আনিতে পারে নাই এই লজ্জাই তাহাকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া সে ফিরিয়া আসিতে পারিল বলিয়া বাবা-মা তাহাকে একটুও অভ্যর্থনা করিবে না? তাহাকে দেখিয়া সুখিয়া কি না পাগলের মত মুখ-ভঙ্গি করিয়া পলাইয়া গেল। সে নিজের বাড়িতেই আসিয়াছে ত'? হ্যাঁ, ঐ ত' বাবার সেক্রেটারিয়েট্ টেবিল, দেয়ালে চন্দন-কাঠের ফ্রেমে সেই ঘড়িটা, সেই ক্যালেণ্ডার! তবে বাবা ফিরিয়া আসেন নাই? পিসিমা ত' আছেন।

ধীরে ধীরে অনিল সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। উপরে উত্তেজিত কণ্ঠে কাহারা সব কথা কহিতেছে—সে কান খাড়া করিয়া রাখিল। মা, বাবা, কাকা, পিসিমা—বুলু! হ্যাঁ, বুলুরই ত' কণ্ঠস্বর! চারিদিকে আবার সে চাহিয়া দেখিল—ভুল করিয়া সে অন্য বাড়িতে ঢুকিয়া পড়ে নাই ত'?

বুলুর গলা, বুলু কথা কহিতেছে, বুলুর মুখ হইতে ঝর্ণার জলের মত শব্দ বাহির হইতেছে—

অনিল এক লাফে তিন সিঁড়ি করিয়া লাফাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাকে অমনি ভঙ্গীতে উঠিতে দেখিয়া সুখিয়া ভয়ে একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল—ঐ এল, আমাকে মেরে ফেললে বাবু! বলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে সে অমরেশবাবুকেই জড়াইয়া ধরিল।

অনিলকে দেখিয়া সবাই আকস্মিক বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্, স্তম্ভিত হইয়া গেছে বুলু—যে বুলু, সেও পর্যন্ত তাহাকে দেখিয়া আনন্দে আর্তনাদ করিয়া উঠিতেছে না! অনিল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল—হ্যাঁ, তাহারই ত' বাবা, মা, ঐ বুলু, কুমার-কাকা—তবে এ কেমন অদ্ভুত লাগিতেছে!

অনিল সকলের দিকে চাহিয়া মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

সবাই তখন সমস্বরে বীণার সমস্ত তারের সমবেত ঝঙ্কারের মত আর্তনাদ করিয়া উঠিল—কে, অনিল না?

—হ্যাঁ, আমাকে তোমরা চিনতে পারছ না?

মা ছুটিয়া আসিয়া দুই ব্যগ্র বাহুতে অনিলকে আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়া পড়িলেন! ঠিক কাঁদিতেছেন না হাসিতেছেন—তাঁহার মুখের সেই বিকৃত শব্দটার কোন অর্থই স্পষ্ট বোঝা গেল না। ছেলের সর্বাঙ্গে স্নেহ-হস্ত বুলাইয়া কপালে ও গালে অসংখ্য চুমা খাইয়া মা বলিলেন—ভূতই ত' বটে!

বুলুকেও মা সেইসঙ্গে কোলে ডাকিয়া লইলেন। বুলু কহিল—কী করে এলি দাদা, আগে বল্।

অনিল বুলুর ডান হাতটা নিজের মুঠিতে টানিয়া লইয়া কহিল—তুই কী করে' এলি, তাই বল?

অনিল ও বুলুকে কোলে লইয়া মা চক্ষু বুজিয়া এই তীব্র অনুভূতিটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অমরেশবাবু কহিলেন—তুই একবার যা, কুমার। থানায় গিয়ে ইনস্পেক্টরবাবুকে খবর দে, ডাকাতদের খোঁজ করবার জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই। অনিলও এসে পড়েছে।

কুমার বাহির হইয়া গেল।

সারা বাড়িতে উৎসবের সমারোহ চলিল। তাহার কী বর্ণনা করি- যে মরিয়া গিয়াছে বলিয়া তোমাদের বিশ্বাস, সে যদি একদিন সত্য-সং সশরীরে বাড়ি ফিরিয়া আসে, তখনকার সেই আনন্দের ছবি তোমরাই কল্প করিয়া দেখিও।